শতাব্দীর শত কবিতা

সম্পাদনা · সমরেন্দ্র ঘোষাল

অঙ্গসজ্জা · গণেশ বসু

মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৯ সাল।

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল। ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯।

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
রয়াল হাফ্ টোন কোং। ৪, সরকার বাই লেন। কলিকাতা-৭।

বাঁধাই
তৈফুর আলী এণ্ড ব্রাদার্স। ১০১, বৈঠকখানা রোড। কলিকাতা-৯।

মুদ্রক :
শ্রীবিভাস গুহঠাকুরতা। ব্যবসা ও ব্যাণিজ্য প্রেস।
৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

দাম—পাঁচ টাকা।

সম্পাদকের বক্তব্য

এই কবিতার সংকলনের প্রয়োজন ছিল কিনা জানিনা, অথবা এর যথার্থ মূল্যবোধ পাঠকের কাছে স্বীকৃত হবে কিনা তাও স্থির বিশ্বাসে বলতে পারি না, তবে এ সংকলন যদি কিছু সংখ্যক পাঠককেও তৃপ্তি দিতে পারে, তবেই জানব আমার প্রয়াস সার্থক হয়েছে।

কবিতার অনুরাগী পাঠক হয়তো অল্প সংখ্যক কিন্তু বিরল নয়। কবিতাকে যারা শিল্প বলেন, আমি তাদের ভাষাতেই বলি; সেই শিল্পের সম্প্রসারে যে সব কবি তাদের স্বীয় প্রতিভার বলে সেই শিল্পের প্রভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধন করেছেন আমি তাদের মধ্যে কয়েকজনকেই এখানে তুলে ধরতে চেয়েছি। এই সংকলনে তাই শুধু বাংলা কবিতাই একমাত্র স্থান পায়নি তার সঙ্গে প্রতিবেশী কবিরাও (তামিল, তেলেগু, উর্দ্দু প্রভৃতি) এই সংকলনে একত্রিত হয়েছেন। তাছাড়াও পাশ্চাত্য কবিদের কিছু কিছু কবিতার অনুবাদও এই সংকলনে রাখতে চেষ্টা করেছি, জানিনা পাঠকদের তৃপ্তি সাধনে আমার প্রযাস সার্থক হবে কিনা।

কাব্য অমৃত রস আস্বাদনের জন্য কবিতার পাঠককে নিজের জগৎ সৃষ্টি করে নিতে হয়, তৈরী করে নিতে হয় নিজের মন ও চিন্তাকে অন্য এক অনুভূতির সৃষ্ট পরিবেশ দিয়ে। কবিতার সেখানেই সার্থকতা, যেখানে কবিতার আনন্দভোগের দুটি রূপের প্রকাশ। এক আত্মকেন্দ্রিক হয়ে কবির নিজস্ব তৃপ্তিসাধন, আর অন্য বহু কেন্দ্রিক হযে সকলের মধ্যে কবির সেই তৃপ্তির আনন্দ উপলব্ধির অংশ বিতরণ করা। কবিতা মানেই সৃষ্টি, আর সৃষ্টি মানেই নিজেকে ফিরে পাওযা। কবিতার প্রতিষ্ঠা সেইখানেই, যেখানে কবিতা সুন্দরের নূপূর পাযে নর্তকীর মত নৃত্যপরায়ণা হয়ে ছন্দ, ধ্বনি এবং অংলকারের হাত ধরে, এক পাঠকের হৃদয দেউল থেকে অন্য পাঠকের হৃদয়-দেউলে নৃত্য করে চলে গতির ছন্দে, অসীমের সাথে মিলিত হবার অপরিসীম আনন্দে, সীমার আবরণ ছিন্ন করে। তাই কবিতায় একদিকে সুন্দরের আবির্ভাব অন্যদিকে উপলব্ধির নিবিড়তা। এই দুয়ে মিলেই কবিতার রসোত্তীর্ণতা। কবিতার

অনুরাগীর সংখ্যা হয়তো কম, হয়তো বা খুবই বিরল। কবিতার অনুরাগী যারা তারা কিন্তু ভিতর দুয়ার খুলে রেখে বাহিরের দুয়ারে কপাট লাগান। তাই কবিতার পাঠক যখন কবির সঙ্গে এসে হাত মেলান কবিতার রসের ভেয়ান পড়ে উপচিয়ে। তাই যিনি 'সহৃদয় হৃদয় সংবেদী' তিনিই প্রকৃত পাঠক।

মালার্মের ভাষায় সুন্দরের প্রকাশ একমাত্র ভাষাতেই সম্ভব। There is only beauty and it has only one perfect expression—Poetry. আমি একথা স্থির চিত্তে বিশ্বাস করি, Poetry of the Earth is never dead.

বাংলা কবিতার আন্দোলন দেখতে পাওয়া যায় সেই তিরিশের কাল থেকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনে নাম লিখিয়েছিলেন। তাঁর শেষের দিককার কবিতাগুলিই তার প্রমাণ। উনিশ শ' পঞ্চাশের পর থেকে বাংলা কবিতা তার মর্য্যাদার আসন ফিরে পেয়েছে। অতি আধুনিকতম কবিদের কবিতাও এখন রসের পাত্রে পরিপূর্ণ গভীর জীবনবোধের পরিচায়ক। উপলব্ধির গভীরতায়, প্রতীতির প্রতিলিখনে কবির ও পাঠকের দুজনেরই চিত্ত-লোকের আলোকে উদ্ভাসিত।

এই সংকলনে এক শ' বছরেরই উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতাই শুধু রাখতে চেষ্টা করেছি; তবে যদি কোন উল্লেখযোগ্য কবি বাদ পড়েন তা নিতান্তই আমার দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেবো। এই সংকলন পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে পারি, তবে তা রসজ্ঞ পাঠকের মনোনয়নের ও পরিতৃপ্তির জন্যই।

এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীসুনীলকুমার মণ্ডল মহাশয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এই ধরণের কবিতার বই প্রকাশ করে তিনি যে দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন, অনেক বড় বড় প্রকাশকেরও তার অভাব দেখা যায়। এই গ্রন্থের নামকরণের জন্য শিল্পী শ্রী গণেশ বসুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন যিনি শ্রদ্ধেয় সেই কানাইলাল সরকারকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

নমস্কার—

সমরেন্দ্র ঘোষাল।

উৎসর্গ

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
শ্রীকানাইলাল সরকার
শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু—

সূচীপত্র

শতাব্দীর
শত
কবিতা

অরণ্য

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

নিস্তব্ধ গম্ভীর ঘোর
নিবিড় গহন,
ঘন-পত্র ঝোপে রুদ্ধ
রবির কিরণ ;
বাহু শাখা প্রসারিয়ে
পরস্পরে আলিঙ্গিয়ে
চক্রাকারে ঘেরে আছে
বৃক্ষ অগণন ;

দীর্ঘ দীর্ঘ স্থূলকায়,
বল্লরী বর্ম্মিত তায়,
কোটরে কোটরে কত
কুলায় শোভন,
কাহারো নেবেছে জটা
এঁকে বেঁকে, কটা কটা
তেড়া চাড়া ঠেকনার
খুঁটির মতন ;
কাহারো শিকড় দল,
উঠিয়ে ব্যাপেছে তল,
কুঞ্জরের কঙ্কালের
পঞ্জর যেমন।

গাঢ় ঘন ছায়াময়
জনমে বিস্ময় ভয়,
নিরন্তর ঝর ঝর
পত্রের পতন ;
কভু মৃগ মৃগী ধায়—
চকিত হইতে চায়,
কভু দূরে শূন্যে যায়
ভীষণ গর্জ্জন !

সন্ধ্যা ● অক্ষয়কুমার বড়াল

দূরে—সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুল তনুখানি ।
তরল গুণ্ঠন—আড়ে
মুখ-শশী উঁকি মারে ;
সরমে উছলি পড়ে কত প্রেম-বাণী !

নব নীলোৎপল মত
আঁখি দুটি অবনত ;
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাঁধিছে চরণ !
পতির পবিত্র ঘরে
সতী পর বেশ করে—
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন !
নয়নে গভীর তৃপ্তি—

ক্ষীরোদ সমুদ্র-দীপ্তি,
অধরে চন্দ্রিকা-হাসি—বিজয়-বিশ্রাম !
নিশ্বাসে মলয়াবেগ,
অলকে অলক-মেঘ,
শুক্রতারা-মুকুতার—নৃত্য অভিরাম !

আসে ধনী আথিবিথি,
কপালে তারকা সিঁথি,
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু—দিনান্ত তপন ;
গুচ্ছে গুচ্ছে কালো চুলে
স্তব্ধ অন্ধকার দুলে ;
দিগন্ত বসনাঞ্চলে কত না রতন !
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব দৃশ্য !
সম্ভ্রমে প্রণমে বিশ্ব,
দেবতা আশিসচ্ছলে বরষে শিশির ।
নদীমুখে কলগীতি,
সমুদ্রে হৃদয়ে স্ফীতি,
অগুরু-চন্দন-ধূপে অলস সমীর ।

ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে—
পুলিনে, তুলসী-তলে,
যেন শত চক্ষু মেলে, হেরিছে ধরণী !
মন্দিরে মঙ্গলারতি,
বালা পূজে সন্ধ্যাসতী ।
পুরনারী ভক্তি ভরে করে শঙ্খ-ধ্বনি ।

কবির অন্ধদশা ● হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভু! কি দশা হবে আমার!
একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন!
সব আশা চূর্ণ ক'রে রাখিলে অবনী প'রে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন!
জীবনে বাসনা যত সকলই করিলে হত
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী;
না পাব দেখিতে আর ভবের শোভা ভাণ্ডার,
চির অস্তমিত দিনমণি!
ধরা, শূন্য, স্থল, জল, অরণ্য, ভূমি, অচল,
না থাকিবে কিছুরি বিচার,
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশদিক ঘোর অন্ধকার
বিভু! কি দশা হবে আমার!

প্রতিদিন অংশুমালী সহস্র কিরণ ঢালি।
পুলকিত করিবে সকলে;
আমার রজনী শেষ হবে না কি, হে ভবেশ!
জানিব না, দিবা কারে বলে?
আর না সুধার সিন্ধু আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জ্বলে,

শিশির বসন্তকাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে !
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নর জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে পাব না দেখিতে নেত্রে
দেবতুল্য মানব-বন্দন !
নিজকন্যা পুত্র মুখ পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র থাকিবে স্মরণ মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা !
কি নিয়ে থাকিব তবে, সিদ্ধ কি সাধনা হবে ?
ভবলীলা ঘুচেছে আমার ;
জীবনের শেষকালে সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু ! কি দশা হবে আমার !

স্বাধীনতা ● রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ॥

কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,

নরকের প্রায়।

দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,

স্বর্গ-সুখ তায় ॥

অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,

ভেরীর আওয়াজ।

সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ হে,

সাজ সাজ সাজ ॥

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,

বাহুবল তার।

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,

দেশের উদ্ধার ॥

অতএব বনভূমে চল ত্বরা যাই হে,

চল ত্বরা যাই।

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,

তুল্য তার নাই ॥

নন্দলাল ● দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে যা করেই হোক রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল, "আহাহা কর কি কর কি নন্দলাল ?"
নন্দ বলিল, 'বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?"
তখন সকলে বলিল— বাহবা বাহবা বাহবা বেশ।

২

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা ?
সকলে বলিল, যাওনা নন্দ করনা ভায়ের সেবা।
নন্দ বলিল, ভায়ের জন্য - জীবনটা যদি দিই
না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার ভেবে দেখি চারিদিক'
তখন সকলে বলিল,— হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে ঠিক।

৩

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সব গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির ;
পড়িল ধন্য—, দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন ;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ !
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা নন্দলাল।

৪

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটা তাহার টিপিয়া ধরিল খালি ;
নন্দ বলিল, আহাহা কর কি কর কি ছাড় না ছাই,
কি হবে দেশের গলা টিপুনিতে আমি যদি মরে যাই ?
বল ক বিঘৎ নাকে দিব খৎ, যা বল করিব তাহা ;
তখন সকলে বলিল — বাহবা বাহবা বাহবা বাহা।

৫

নন্দ বাড়ির হ'ত না বাহির কোথা কি ঘটে কি জানি ;
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি ;
নৌকা ফি'সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ী চাপা পড়া ভয়
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল — ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল”

কবি ● মধুসূদন দত্ত

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?

সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী
যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ - কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে।

কীর্তিনাশা ● নবীনচন্দ্র সেন

১

সকলি কি স্বপ্ন! বল ছিল কি এখানে
অভ্রভেদী সেই একবিংশতি রতন ?
যেই সৌধচূড়া হ'তে বিশাল পদ্মায়,
বোধ হত ঠিক উপবীতের মতন ?
সে বিশাল রাজপুরী ছিল কি এখানে,
পড়িয়াছে ছায়া যার বঙ্গ ইতিহাসে ?
যাহার বিশাল ছায়া লঙ্ঘিয়া পদ্মায়,
পড়েছিল এ দেশের হৃদয়-আকাশে ?

২

সে রাজনগর একি ? সকলি স্বপন !
স্বপনের মত সব গেছে লুকাইয়া।
বঙ্গ-সিংহাসন ছিল আকাঙ্খা যাহার।
একটি ইষ্টক তার নাহি নিদর্শন !
অনল সলিল-গর্ভে পড়িল ভাঙ্গিয়া
কর্ত্তা, কীর্ত্তি,— কি সাদৃশ্য ! পশিল অতল
চক্র, চক্রী · হায় ! এই বিষময় ফল,
অমর কলঙ্ক মাত্র রহিল কেবল।

৩

কীর্ত্তিনাশা মানবের ভীষণ শিক্ষক।
ইষ্টক উপরে করি ইষ্টক স্থাপন,
লভিবারে অমরতা বাসনা যাহার,
লিখিতে বাসনা যার রজতের ধারে
কালগর্ভে অমরতা, আসি একবার
রাজবল্লভের এই কীর্ত্তির শ্মশানে,
দেখুক তোমার নীরে স্তম্ভিত-নয়নে
তাহার অদৃষ্ট লিপি ; ভাবী সমাচার
তব মৃদু কলকলে শুনুক শ্রবণে !

৪

মরি কিবা অভিমানে যাইছ রহিয়া—
সন্ধ্যালোকে কীর্ত্তিনাশা ! আনন্দে যেমতি
বিজয়ী বীরেন্দ্র যায় মৃদু-মন্দগতি
উপেক্ষি বিজিত শত্রু চলেছ তেমতি

উপেক্ষিয়া ভগ্ন তীর। কি শান্ত হৃদয়
গণা যায় একে একে তারকা সকল
প্রতিবিম্বে নীল জলে! কি স্রোত মধুর
ঝরিবে না গোলাপের কামিনীর দল।

৫

এত অভিমান যদি, ধর তবে নদী,
ধর একবার সেই ভীষণ আকার,
রাজ বল্লভের পুরী গ্রাসিলে যেরূপে।
ভীষণ-ঘূর্ণিত স্রোতে ছাড়িয়া হুঙ্কার
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে, তরঙ্গ-ফুৎকারে
প্রকম্পিত দিগ্মণ্ডল করি বিধ্বনিত,
যে মূর্ত্তিতে বালকের ক্রীড়াযষ্টিসতত,
ডুবালে সে কীর্ত্তিরাশি, কল্পনা-অতীত,—

৬

ধর সেই মূর্ত্তি, আমি দেখাব তোমায়
বঙ্গ ইতিহাসের সে পৃষ্ঠা ভয়ঙ্কর।
দেখাব বিপ্লব-চিত্র ঘূর্ণচক্রে যার
ডুবিলেন এই রাজনগর-ঈশ্বর!
তুচ্ছ এই ক্ষুদ্রপুরী,—সেই ঝটিকায়
একটি বিশাল রাজ্য পড়েছে ভাঙ্গিয়া।
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র শান্তি,—দেখহ চাহিয়া
কি শান্তি পশ্চাতে তুমি গিয়াছ রাখিয়া।
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র সৃষ্টি, ওই বালুচর –
একই নিশ্বাসে যাহা পার মিশাইতে,—

সে বিপ্লবে যেই রাজ্য গিয়াছে সৃজিয়া
না ধরে শকতি কাল কণা খসাইতে !

৭

দূর হোক ইতিহাস ; দেখ একবার
মানব-হৃদয়-রাজ্য । দেখ নিরন্তর
বহিতেছে কি ঝটিকা ! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কতই গগন স্পর্শী হর্ম্ম্য মনোহর
ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে ! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কত রূপান্তর তার ! উঠিছে জাগিয়া
কতই নূতন সৃষ্টি, কত পুরাতন
নয়ন না পালটিতে যাইছে ভাসিয়া !

৮

কীর্ত্তিনাশা !—কিবা নাম, কিবা অভিমান
পার তুমি মানবের কি কীর্ত্তি নাশিতে ?
সেই পৃষ্ঠা হতে কলুষিত নাম ?
বঙ্গ-ইতিহাসের সে কাল-পৃষ্ঠা হতে
একটি অক্ষর তুমি পার কি মুছিতে ?
মুছিলে যেমন এই ধরাপৃষ্ঠ হতে
রাজবল্লভের কীর্ত্তি, পার কি মুছিতে ?
সেই পৃষ্ঠা অন্যরূপ পার কি লিখিতে ?

৯

কীর্ত্তিনাশা ! বৃথা নাম ! বৃথা অভিমান !
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার ?
নাশিতে করের সৃষ্টি সর্ব্বশক্তিমান্
মানস সৃষ্টিতে তব নাহি অধিকার !

ভারতের পরাক্রান্ত ভূপতি নিয়ে
হয়েছে অদৃশ্য সহ রাজ্য-সিংহাসন,
ত্রিকালের সীমা ওই দেখ নিরূপিয়া
দাঁড়ায়ে রয়েছে তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
নশ্বর জোনাকি রাশি গিয়াছে নিবিয়া,
অমর তারকাবলি রহেছে চাহিয়া।

১০

তুচ্ছ তুমি কীর্ত্তিনাশা! মহাকাল-স্রোত
ওই দেখ দূর হতে যাইছে নামিয়া
তাহাদের কীর্ত্তিরাশি। কর-পরশনে
চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ রয়েছে বাঁচিয়া!
একটি চরণ রেণু যেই পুণ্যবান
পাইয়াছে তার কীর্ত্তি করিতে বিনাশ
নাহিক শকতি তব, পারিবেনা তুমি
কীর্ত্তিনাশা! কিংবা কাল সর্ব্ব-কীর্ত্তিত্রাস।

১১

আমি কীর্ত্তিহীন নর না ডরি তোমায়
তব সংহারক মূর্ত্তি ধর কীর্ত্তিনাশা!
তব ভগ্নতীরে ওই মূল শূণ্য তরু
আমার অধিক রাখে জীবনের আশা।
তাহারো ফলিবে ফল ফুটিবে কুসুম;
নিষ্ফল জীবন মম। পড়েছে ঝরিয়া
আছিলা যে কটি ফুল, থাক সেই তরু
দয়া করি কীর্ত্তিহীনে নেও ভাসাইয়া।

সেথা আমি কি গাহিব গান? ● রজনীকান্ত সেন

সেথা আমি কি গাহিব গান
যেথা, গম্ভীর ওঙ্কারে, সামঝঙ্কারে
কাঁপিত দূর বিমান।

যেথা, স্বরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা
রোধি তটিনী জল প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।

যেথা, আলোড়ি 'চন্দ্রলোক শারদ,
করি হরি গুণগান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান।

যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্য পরশে,
মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে,
মুগ্ধ কমলাকান্ত চরণে
জাহ্নবী জনম পান।

বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মূরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ.
আর কি আছে সে প্রাণ ?

শিকল ভাঙার গান ● অতুল প্রসাদ সেন

পরের শিকল ভাঙ্গিস্ পরে,
নিজের নিগড় ভাঙ্গ রে ভাই,
আপন কারায় বদ্ধ তোরা,
পরের কারায় বন্দী তাই,
হারে মুর্খ ! হারে অন্ধ !
ভাইয়ে ভাইয়ে করিস্ দ্বন্দ্ব ?
দেশের শক্তি করিস্ মন্দ,
তোদের—তুচ্ছ করে সবাই তাই।
সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই,
মন্দিরে মসজিদে লড়াই,
প্রবেশ করে দেখরে দু'ভাই.
—অন্দরে যে একজনাই !
দেশ মাতার আর বিশ্বমাতার,
ম্লেচ্ছ, কাফের, এক পরিবার ;
নয় তুরস্ক, নয়কো তাতার,
জন্ম মৃত্যুর এই যে ঠাঁই।

ভিন্ন জাত আর ভিন্ন বংশ
এক জাতি তাই একশ অংশ ;
হিন্দু রে, তুই হবি ধ্বংস,
না ঘুচালে এই বালাই।
ভাইকে ছুঁলে পদতলে,
শুদ্ধ হোস্ তুই গঙ্গাজলে ;
ওরে—সেই অচ্ছুৎ ছেলেই তুলে কোলে,
তুষ্ট হল যে গঙ্গামাঈ।
খাবিনে জল ভাইয়ের দেওয়া,
খাসনে অন্ন তাদের ছোঁওয়া,
ওরে, শবরীর আধ-খাওয়া মেওয়া
রঘুনাথ ত খেলেন তাই !
তোরাই আবার সভাস্থলে,
হাঁকিস্ 'সাম্য' উচ্চ রোলে,
সমতন্ত্র চাস্ সকলে,
বিশ্ব-প্রেমের দিস দোহাই।
জাতির গলায় জাতের ফাঁস।
ধর্ম্ম করছে সর্ব্বনাশ,
নিজের পায়ে পরলি পাশ,
দাসত্ব ঘোচে না তাই।
ছাড় দেখিরে রেষারিষি,
কর প্রাণে প্রাণে মেশামিশি,
তখন তোদের সব বিদেশী
'দাস' না বলে বলবে 'ভাই।'

আমি ● —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্ব কথা
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—
না—না—না।
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ
না-আমি, না-তুমি।
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা

মানুষের সীমানায়।
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমির গহনে আলো আঁধারের ঘটল সংগম
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস,
'না' কখন ফুটে উঠল 'হাঁ' মায়ার মন্ত্রে
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।
একে বোলোনা তত্ত্ব,
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব—আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।

পণ্ডিত বলছেন,—
বুড়ো চন্দ্রটা নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মত গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্ব্বতে ;
মর্ত্তলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমা খরচ ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।

মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,

মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙ্গুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমা হীন আকাশে
ব্যক্তিত্ব হারা অস্তিত্বের গণিত তত্ত্ব নিয়ে।

তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে ; অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনখানেই -
"তুমি সুন্দর"
"আমি ভালবাসি"।
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগ যুগান্তর ধরে—
"কথা কও, কথা কও"
বলবেন, "বলো তুমি সুন্দর"
বলবেন, বলো, "আমি ভালবাসি"।

বাসরে বাস্
কোন উদাস
উঠল আজ
মোদের মাঝ ?
আজ নূতন
উদ্বোধন
বীণ্ পাণির
সুর বাণীর।
দুব্ ঘাসে
কোন হাসে ?
নারিকেলের
পত্রে ফের
বয় বাতাস
চায় আকাশ।

জারুল ফুল
পারুল ফুল
ফুটল রে
আসল কে ?
এই মাঠে
এই নাটে
কোন পরী
পাঁচ-নোরী
বাজিয়ে যায়
চম্‌কে চায় ?
আজ মোদের
মুখ চোখের
ভাব হাসি
নেয় আসি
ঐ অথির
ভোর সমীর
আম কাঁঠাল
ভরল ডাল।

বাহবা কী
সব পাখী
গাচ্ছে গীত
ভাব-মোহিত।
বুলবুলি
বিলকুলি

সুর মগন
আজ লগন
কার বিয়ের ?
কার ঝিয়ের ?
সোনার ফুল
তাই আকুল
ঐ তো বোন্
হলদে কোন
তার শাড়ি
যায় নাড়ি ।
তার চোখের
অশ্রু ঢের
মান পাতায়
টলমলায় ।

শোনরে শোন
আজকে কোন
মন-মোহন
এই মিলন ।
আজকে বোন্
সাবাস্ জন্
লুটবে তার
পুরস্কার
গুণ আদর
কার কদর
সাবাস ভাই
এই তো চাই
পুর বছর
এমনি জোর
নেবই সই,
কাপড় বই
বাহবা রে
আজ কারে
মিলন বই
বলব সই ।
লক্ষ্মী ভাই
হওয়াই চাই
নৈলে ছাই
মিলবে নাই ;
গুরু জনে
সদা মনে
ভক্তি চাই
নৈলে ভাই
সুখ সে নাই
কোনই ঠাঁই ।

এই সভায়
আজ সবায়

কর প্রণাম
লাল সালাম।
বাহবা কী
আজ খুশী।
এমনি জোর
সব বছর
চাই হাসি
আর খুশী।
আজকে তবে বিদায় ভাই।
লক্ষ্মী মেয়ে হও সবাই।

অপরাজিতা ● যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পরাজিতা তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর 'অপরাজিতা' নাম ?
গন্ধ কি তোর বিন্দুমাত্র আছে ?
বর্ণ-সেও ত নয় নয়নাভিরাম !
ক্ষুদ্র শেফালি, তারো মধু সৌরভ ;
ক্ষুদ্র অতসী, তারো কাঞ্চনভাতি ;
গরবিনি, তোর কিসে তবে গৌরব—
রূপগুণহীন বিড়ম্বনার খ্যাতি !
কালো আঁখিপুটে শিশির অশ্রু ঝরে—
ফুল কহে—মোর কিছু নাই কিছু নাই,
তোমরা যে নামে ডাকিয়াছ দয়া করে
আমি শুধু ভাই তাই আমি শুধু তাই।
ফুল সজ্জায় লজ্জায় যাই নাকো ;
পুষ্পমালায় নাহিক আমার স্থান ;

প্রিয়-উপহারে ভুলেও কি মোরে ডাক ?
বিবাহ বাসরে থাকি আমি ম্রিয়মাণ
মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
পূজা শুধু পূজা জীবনের মোর ব্রত ;
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে
অন্তরযামী—তিনিও তোমারি মত ?

যমুনা লহরী ● গোবিন্দচন্দ্র রায়

১

নির্মল সলিলে বহিছে সদা
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও !
কত কত সুন্দর নগরী-তীরে
বাজিছে তটযুগ ভূষি'ও ।
পড়ি জল-নীলে ধবল সৌধ-ছবি
অনুকারিছে নভ অঞ্জন ও !

২

যুগ যুগ বাহী প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও !
তব জল বুদ্বুদ ! সহ কত রাজা
পর কাশিল লয় পাইল ও !

৩

কল কল ভাষে বহিয়ে, কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও !

স্মরণে আসি' মরম পরশে কথা
ভূত সে ভরিছ গাথা ও!

৪

তব জল কল্লোল সহ কত সেনা—
গরজিল কোনদিন সমরে ও!
আজি সব-নীরব, রে যমুনে, সব
গত যত বৈভব কালে ও!

৫

শ্যাম-সলিল তব লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব কুরুকুল—শোণিতে ও!
কাঁপিল দেশ তুরগ-গজ ভারে
ভারত স্বাধীন যেদিন ও!

৬

তব জল-তীরে পৌরব যাদব
পাতিল রাজ সিংহাসন ও!
শাসিল দেশ অরিকুল নাশি
ভারত স্বাধীন যেদিন ও!

৭

দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ পতাকা
উড়িতে দেশে বিদেশে ও!
তিব্বত চীনে ব্রহ্ম তাতারে
ভারত স্বাধীন যেদিন ও!

৮

এ পয়ঃ পারে কত কত জাতীয়

ভাঙিল কত শত রাজা ও !

আসিল স্থাপিল শাসিল রাজ্য

রচি ঘর কত পরিপাটী ও !

৯

কত শত দূর্জয় দুর্গম দুর্গে

বেড়িল তব তটদেশে ও ?

নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে

চিরযুগ সম্ভোগ আশে ও !

১০

সে সব কৌতুক কাল-কবল আজি

লেশ না রাখিল শেষ ও !

কোথা সেই গৌরব নিকুঞ্জ সৌরভ

হ'ল পরিণত শত কাহিনী ও !

হিমাচলে ● বিজয়চন্দ্র মজুমদার

জ্বলে   শৈলে সূর্য্য-কিরণ-বিম্ব
দলিত ছিন্ন কুজ্ঝটি
যেন   তুষারে ধবল গিরির শৃঙ্গ
ধেয়ান মগ্ন-ধূর্জ্জটি।
ঐ   সানুর সোপান-মালার ঊর্দ্ধে
শৃঙ্গ চরণ রঞ্জিকা,
শোভে   অভ্র সুষমা, যেন রে শুদ্ধা
গৌরকান্তি অম্বিকা।
তথা   অর্দ্ধ-ধূসর ভূধর খণ্ড
দাঁড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে
যেন   নন্দীর মত রুদ্র প্রহরী
দলিছে চরণে রৌরবে ;
সেথা   স্তব্ধ চপল বাসনা মানসে
হত লালসার উগ্রতা,
রাজে   মৌন মুক্ত শঙ্কর-পদে
তাপসীর চারু শুভ্রতা।

নব নিদাঘ ● যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ নব নিদাঘের ঘোর।
ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া সকল কর্ম্ম তোর!
বিছায়ে নে মোর শিথিল শরীর শ্লথ আঁচলের প্রায় ;
চেয়ে থাক্ দূরে- অর্দ্ধ শয়নে আধখোলা জানালায়!

দুপুর বেলার রূপালি রৌদ্র ফুলদল পড়ে নুয়ে;
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ;
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া গুমট করিয়া আছে
অমনি গান কি গন্ধের মতো ঘুরে বেড়া মোর কাছে !

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিঁঝির পাখার মত
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি কে হাপরে ফুঁ দিতেছে অবিরত ?
দিকে দিকে দিকে, জানিনা কি পাখী হাতুড়ি ঠুকিছে ডালে,
কোন রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা, গড়িছে বিশ্বশালে ?

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে নির্জ্জন ঘাটে জাগিছে একার মায়া ?
মরিচীকা চাহি শ্রান্ত পথিক ফুকারে ফটিক জল,
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়া ছাড়ে না অশথতল।

আজিকে বিশ্ব কি মধু-মধুর মদির নেশায় ভোর !
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার ঘূর্ণি হাওয়ার ঘোর।
বাসনা তাহার মরিচীকা হয়ে আঁকা পড়ে দূর পটে ;
কল্পনা তার গুণ গুণ করে অলিগুঞ্জনে রটে।

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ মিলন স্বপন দেখে।
সুদূর অতীত কাছে আসে আজ গোপন সেতু বাহি!
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন মোর মুখপানে চাহি!

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা সাহারা-প্রান্ত হতে
এসেছে রে কারা কোন্ বসরার খর্জুর বীথিপথে;
কত বেদুয়ীন্ পার করে মরু দীপ্ত অগ্নিঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে তরুণী ইরাণী বালা!

মর্ম্মরে গাঁথা মর্মবেদীতে, কে পাতি পদ্মপাতা,
পত্র লেখায় লিখিতে অঙ্গ ঘুমে ঢুলে পড়ে মাথা!
আঁখি মুদে একা পড়ে আছি এই সুখ স্মৃতি ঘেরা নীড়ে
প্রাণ ভরে যায় চেনা অচেনার মিলন মধুর ভিড়ে!

বেলা পড়ে আসে বধূ চল ঘাটে ভরিতে সাঁঝের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল চ্যুত ছায়া-অঞ্চল!
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে নিদাঘ নিশীথ ঘোর
ওরে মন আয়, ছিঁড়ে ফেলে আয় সকল কর্ম-ডোর।

চাতক ● মানকুমারী বসু

সরিছে আঁধার কালো ;
উষার নবীন আলো
দেখাইছে জগতের আধো আধো ছবি ;
এত ভোরে কোন্ পাখী !
গাহিছ আকাশে থাকি,
জাগাইয়া ধরাতল মাতাইয়া কবি ?
মধুর কাকলী মুখে
খেলিছ মনের সুখে,
হেরি ও মাধুরী মরি নয়ন জুড়ায় !
সুনীল গগন কোলে,
কাঞ্চনের ফোঁটা দোলে,
সজীব কুসুম যেন পবনে উড়ায় !
কি জানি কি যোগ বলে,
স্বরগে যেতেছ চলে,
দেখি যেন থেকে থেকে জলদে লুকাও ;
দেবতার শিশুগুলি
খেলে যেথা হেলি দুলি,
কে তুমি তাদের সনে খেলিবারে যাও ?
চিনেছি চিনেছি আমি,
ওই যে চাতক তুমি,

প্রভাতী কিরণ মেখে কর ঝলমল ;
নাচিছ তপন আগে ,
জাগাইছ জীব-ভাগে ;
সুললিত গানে মরি মাতায়ে ভূতল !

শুনি ও অমৃত গীতি
কার না জনমে প্রীতি ?
কে যেন অমৃত ধারা ঢালিছে ধরায় ।

ছুটিছে অমৃত রাশি
অমৃত হিল্লোলে ভাসি ;
অমৃত-তুফানে যেন মন ভেসে যায় ।

হেন গান কোথা ছিল ?
কে তোমারে শিখাইল ?
কহ রে চাতক ! মোরে সেই সমুদয় ;

আমি তো বুঝেছি এই,
জগত-জননী যেই,
তাঁহারি শিখানো গীত, আর কারো নয় !

যে সাজায় রামধনু,
যে হাসায় শশী-ভানু,
অমল কমল যেই সলিলে ভাসায় ;

যাঁহার কৌশল বলে
গ্রহ তারা শূন্যে চলে,
তোমারে এ হেন গীতি সেই রে শিখায় !

অমন মধুরে পাখী !
তারেই ডাকিছ নাকি
স্বরগ দুয়ারে উঠি' পরাণ খুলিয়া ?
তুমি রে ! ডাকিছ যাঁরে,
আমি সদা ডাকি তাঁরে,
আমি ডাকি ধরাতলে হৃদয় ভরিয়া !

পাছে লোকে কিছু বলে ● কামিনী রায়

করিতে পারিনা কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে

আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্ মত
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে
পাছে লোকে কিছু বলে !

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি,
সযতনে শুষ্ক রাখি
নিরমল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

একটি স্নেহের কথা,
প্রশমিতে পারে ব্যথা—
চ'লে যাই উপেক্ষার ছলে
পাছে লোকে কিছু বলে !

মহৎ উদ্দেশ্য যবে,
একসাথে মিলে সবে,
পারিনা মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

বিধাতা দেছেন প্রাণ
থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

ঝর্ণা ● সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরুলিত চন্দ্রিকা! চন্দনবর্ণা!
অঞ্চলে সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে,
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি যৌবন তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিতলোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে যুঁই ফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুমকীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা ছায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা!

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে—
গিরী-দরী বিহারিণী হরিণীর লাস্যে—।
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে করগো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্‌না;
ঝর্ণা!

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী !

পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী !

পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,

হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,

স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্তে সুপর্ণা !

ঝর্ণা !

মঞ্জুল ও হাসির বেলোয়ারী আওয়াজে

ওলো চঞ্চলা ! তোর পথ হলো ছাওয়া যে !

মোতিয়া মোতির কুঁড়ি মূরছে ও অলকে ;

মেঘলায়, মরি, মরি রামধনু ঝলকে !

তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা !

ঝর্ণা !

ব্যর্থ জীবন ● প্রমথ চৌধুরী

মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে।
হৃদয় ভাঙেনি মোর কৈশোরের পরশে।
কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে।
যৌবন-জোয়ারে ভেসে ডুবিনি বিলাসে।
চাটুপটু বক্তা নহি, বড়ো এজলাসে।
উদ্ধার করিনি দেশ, টানিয়া চরসে!
পুত্র কন্যা হয় নাই বরষে-বরষে।
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে।
পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।

অন্যে কভু দিই নাই নীতি উপদেশ।
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি, দেশে কি বিদেশে।
বুদ্ধি কভু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ
তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে।

বাসনা ● করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে পর্ণ-কটীর হ'তে
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায় ছুটব আলি-পথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে শুকতারাটি জাগবে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে সুরের মিঠে স্রোতে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে মোতির 'সাতনরী'
কদম কেশর শিউরে উঠে পড়বে ঝরঝরি,
মাঠের কোণে যাবে দেখা বৃষ্টি ধারার 'চিকে' ঢাকা,
কেয়া-ঝাড়ের মাথার পরে নারিকেলের সারি।

শিল কুড়ায়ে বাঁধব 'মোয়া', লাঙল দেব ভুঁয়ে,
কড়্ কড়্ কড়্ ডাকবে 'দেয়া' আসবে আমন রুয়ে।
আকাশ-ভাঙা মুষল-ধারে, তোলপাড় কি বাঁশের ঝাড়ে,
পাকুড়, তেঁতুল, ঝাউয়ের ঝাড় পড়বে নুয়ে নুয়ে।

কামারশালে বস্‌ব গিয়ে রৌদ্র এলে পড়ি'
কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে টানব যাঁতার দড়ি ;
চালের কোলে জমবে ধোঁয়া, কাঁপিয়ে 'নেয়াই' পিট্‌ব লোহা
ছিটিয়ে দেব আগুন যুঁই—আলোর ছড়াছড়ি।

শুনতে যাব ভারত কথা, রামায়ণের গান,
সীতার দুঃখে চোখের জলে গলবে মনঃপ্রাণ ;
বনবাসের করুণ কথা শুনতে বুকে বাজবে ব্যথা,
ফিরব ঘরে দুঃখ-ভরে মুগ্ধ ম্রিয়মাণ।

সারাদিনের শ্রান্তি-ভরা শিথিল আঁখির পাতে
স্বপ্ন-হারা ঘুমের আরাম ভোগ করিব রাতে।
না ফুটিতেই উষার আঁখি, না ডাকিতেই ভোরের পাখী,
ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ' প্রাণের একতারাতে।

ফাগুন দুপুরে ● সজনীকান্ত দাস

ফাগুন-দুপুরে আগুন জ্বলিছে খাঁ খাঁ করে চারিদিক,
ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর শূন্য ছাদের 'পরে—
সৃজন করিছে দগ্ধ মরুর মরীচিকা যেন ঠিক ;
শ্মশান-নগরী ঝিমায় তন্দ্রাভরে।
অর্গল-আঁটা সব বাতায়নে, পাণ্ডুর নীলাকাশ,
ঝাঁকে ঝাঁকে চিল উড়িছে কিসের লোভে ;
কপোত-কপোতী আলিসার কোণে ফেলিছে ক্লান্ত শ্বাস,
কা কা করে কাক যেন কী মনঃক্ষোভে।

পতিতপত্র দেবদারু-শাখে ঝলসিছে কিশলয়,
নারিকেল তরু এলায়েছে পাতাগুলি।
চড়াই খুঁজিছে শূন্য খোপেতে সুনিভৃত আশ্রয় ;—
তপ্ত উঠানে ফেরে না কাকলি তুলি।

ঘূর্ণী হাওয়ায় শুষ্কপত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়ে,
ধুলী-কুণ্ডলী কভু বা ধরিছে ফণা,
বাতাস কাঁদিছে অতি দূরে কোথা চাপা কান্নার সুরে
'ফাগুন আগুনে' যেন সে ক্ষুণ্নমনা।

বধূ-প্রসাধন ● মোহিতলাল মজুমদার

১

যে বেদনার রক্ত রাঙা অশোক ফুলের
অশোক হাসি ফোটে—
ফাল্গুনেরই আনন্দ নন্দিনী ;
আজকে সে রঙ তুলির মুখে একটুখানি
ছুঁইয়ে দিলাম ঠোঁটে—
বইবে হাসির নিত্য নির্ঝরিণী।
জ্যোৎস্না রাতে ঝাউয়ের শাখা ঘাসের উপর
ঘনায় যে সেই ছায়া
গভীর কালো ঘুমের ঘন ঘোর,
সরিয়ে দিয়ে চুলের গোছা সেই কাজলের
মদির মেদুর মায়া
পরিয়ে দিলাম-চোখে স্বপন ডোর।
জরা-মরণ তুচ্ছ করা রূপের আবীর—
অসীম উষার ভূষা,
ঋষি কবির সীমন্তিনীর ভালে
সেই যে সিঁদূর, তাইতে ভরি দিলাম হাতে
এ ছন্দ মঞ্জুষা,
প্রিয় যেন পরায় পদ্মনালে।

চির-বাসর নিশার যে বেশ, বধু বরের
মঞ্জু চীনাংশুক—
কল্পনারই কল হংস-আঁকা,
বুনেছি সেই শোভায় বসন দোঁহার লাগি
এতই সমুৎসুক,
কাঁপছে আঙল, পাড় বা হল বাঁকা।

২

তবু যখন দেখবে চেয়ে তারার পাঁতি
আঁধার-বাতায়নে
পড়বে মনে আজিকার এই রাতি,
বাজবে বাঁশী মনে-মনেই, জ্বলবে বাতি
প্রাণের সুনির্জনে,
দাঁড়িয়ে পাশে চিরদিনের সাথী।
তখন বালা! এই যে ডালায় সাজিয়ে দিলাম
অরূপ প্রসাধন
কল্পতরুর নিত্য ফোটা ফুল
এইতো যবে দেহের মনের সত্যিকারের
সজ্জা চিরন্তন,
নিশার চুলে তারার সমতুল!
দিলাম না যে একটি সাথে, সেটি তোমার কাছেই
আছে জানি।
আজকে তাহাই পরবে ক্ষণে ক্ষণে—

ওড়না-আড়ে গাল দুখানির সেই যে হঠাৎ
গোলাপ আভাখানি,
সে-জন যখন চাইবে সংগোপনে ;
এমনি করেই কাটুক জীবন—আজিকার এই
নব মিলন মধু।
হোক নব নিত্য আস্বাদনে,
চিনবে যতই ততই চেনার শেষ পাবেনা
প্রণয়-পাতাল বঁধু
তোমার প্রেমের সীমার অন্বেষণে ॥

গন্ধ বিচার ● সুকুমার রায়

সিংহাসনে বসল রাজা বাজল কাঁসর ঘণ্টা,
ছট্‌ফটিয়ে উঠ্‌ল কেঁপে মন্ত্রী বুড়োর মনটা।
বললে রাজা, "মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ ?"
মন্ত্রী বলে, "এসেন্স দিচ্ছি—গন্ধ ত নয় মন্দ !"
রাজা বলেন, "মন্দ ভাল দেখুক শুঁকে বদ্যি,"
বদ্যি বলে, "আমার নাকে বেজায় হল সর্দি।"
রাজা হাঁকেন, "বোলাও তবে—রামনারায়ণ পাত্র।"
পাত্র বলে, "নস্যি নিলাম এক্ষুণি এইমাত্র—
নস্যি দিয়ে বন্ধ যে নাক গন্ধ কোথায় ঢুকবে ?"
রাজা বলেন, "কোটাল তবে এগিয়ে এস, শুঁকবে।"

কোটাল বলেন, "পান খেয়েছি মশলা তাতে কর্পূর,
গন্ধে তারি মুণ্ড আমার একেবারে ভরপুর।"
রাজা বলেন, "আসুক তবে শের পালোয়ান ভীম সিং"
ভীম বলে, "আজ কচ্ছে আমার সমস্ত গা ঝিম্ ঝিম্।
রাত্রে আমার বোখার হ'ল বলছি হুজুর ঠিক বাৎ—"
বলেই শু'ল রাজসভাতে চক্ষু বুজে চিৎপাত।
রাজার শালা চন্দ্রকেতু তারেই ধরে শেষটা,
বলল রাজা, "তুমিই না হয় কর না ভাই চেষ্টা।"
চন্দ্র বলেন, "মারতে চাও ত ডাকাও নাকো জল্লাদ,
গন্ধ শুঁকে মরতে হবে এ আবার কি আহ্লাদ?"
ছিল হাজির বৃদ্ধ নাজির বয়সটি তার নব্বই,
ভাবল মনে, "ভয় কেন আর একদিন ত মরবই,"
সাহস ক'রে বল্‌ল বুড়ো, "মিথ্যে সবাই বকাছস্,
শুঁকতে পারি হুকুম পেলে এবং পেলে বকশিস্।"
রাজা বলেন, "হাজার টাকা ইনাম পাবে সদ্য!"
তাই না শুনে উৎসাহেতে উঠল বুড়ো মদ্দ।
জামার 'পরে নাক ঠেকিয়ে—শুঁকল কত গন্ধ,
রইল অটল দেখল লোকে বিস্ময়ে বাক্-বন্ধ।
রাজ্যে হ'ল জয় জয়কার বাজল কাঁসর ঢক্কা,
বাপ্‌রে কি তেজ বুড়োর হাড়ে পায়না সে যে অক্কা?"

সাধনা ● প্রিয়ংবদা দেবী

বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি
হে ধরিত্রী, জীবধাত্রি! নিত্য দিনযামী
মাতৃহৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান লাগি, নিয়ত ক্রন্দন
তারি লুপ্ত স্পর্শ তরে, করি দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহাশব্দময়
অনন্ত স্পন্দন-মাঝে ; শিখাও আমায়
সে পুণ্য-রহস্য-মন্ত্র-যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি' বিয়োগ-বেদন
লক্ষ কোটী সন্তানের, প্রশান্ত বদন।

তবু ফুটাতেছ ফুল, জ্বালিছ আলোক
উজ্জলিয়া রাত্রিদিন দ্যুলোক, ভূলোক!

গ্রাম্য ছবি ● গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

মাটিতে নিকানো ঘর দাওয়াগুলি মনোহর
সমুখেতে মাটির উঠান।

খড়ো, চালখানি ছাঁটা, লতিয়া করলা-লতা
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।

পিঁজারায় বস্ত্র বাঁধা বউকথা কহে কথা
বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে ;

মঞ্চে তুলসীর চারা গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।

কানে দুল ছলছল্ গাছভরা পাকা কুল
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোনে ;

ছোটো হাতে জোর করে শাখাটি নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে হাত লয় টেনে।

পুকুরে নির্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁস দুটি করে সন্তরণ,
পুকুরের পাড়ে বাঁশবন।

শূন্য জন কোলাহল কিচি মিচি পাখিদল
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদটুকু সোণার বরণ।

লুটায়ে চুলের গোছা, বালাদুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে।

শান্ত স্তব্ধ দিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে,
তরুতলে রাখাল শয়ান,
সরু মেঠো রাস্তা বেয়ে পথিক চলেছে গেয়ে.
সাথে মিশে ঘুঘুর সে তান।

ভস্মলোচন ● প্রেমেন্দ্র মিত্র

কোন মুলুকে চরে জানো
ভস্মলোচন হায়না ?
মরা চিবোয় আধমরাদের
জ্যান্ত ভয়ে খায়না।
জ্যান্ত এবং মরায় যেথায়
তফাৎ নাই
হায়না হাসে সেই শ্মশানে
শুনতে পাই।
ও মড়া তুই জাগবিনে ?
থাকবি পড়ে ডাষ্টবিনে!
নিজের খুলি খুলে ধরে
পরম কারণ চাখবিনে ?

ভস্মলোচন হায়না
সব মুলুকেই স্থায়না।
লক লকে জিভ বুলিয়ে বেড়ায়
যেথায় তাকায় সবই পোড়ায়
নিজের মুখে চায়না।
ও মড়া তুই জ্যান্ত হ,
আন দেখি সেই আয়না।
নিজের চোখেই নিপাত ডাকুক
ভস্মলোচন হায়না।
শব-জাগানো মন্ত্র দেবে
কোন্ কাপালিক ভৈরবী ?
অরণ্যে সার করুণ রোদন·
ছড়া কেটেই যায় কবি।

ময়নামতী ● আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

জানিনা কেন দখিন দেশী মেয়েটা এত বোকা
মনটা তার মজেছে ফুটপাথে,
হয়না আজো নতুন হয়ে নতুন ঘরে ঢোকা—
সন্ধ্যাদীপ জ্বলেনা তার হাতে !

পড়েনা মনে কোথায় কোন নদীর তীরে তার
পাখীর দেশে মনের নীড় ছিল
চোখের জলে গোপনে গেঁথে গজমোতীর হার
ময়নামতী কী যেন চেয়েছিল।

দুঃখ তার কখনো নাকি ওপারে ডালে ডালে
পলাশ-আকাশে হতো গান,
আশারা তার রসিক হয়ে দিক হারানো পালে
সখি-নদীর ভাঙ্গাতো অভিমান।
দিনের শেষে মন্ত্র পড়ে সারারাতের মন
প্রদীপ হয়ে জ্বলতো নাকি ঘরে,
হায়রে যেন ঝরাফুলের হারানো গুঞ্জন
ঝাপসা সবই আবছা মনে পড়ে !

কী যেন আসে আকাশ ভেঙে
পা ফেলে কালো ঝড়ে
পালিয়ে যায় ময়নামতী
আশার হাত ধরে।

সে নাকি শোনে এখানে এই পাথরে পেতে কান
সমুদ্রের গাজন দিনে রাতে,
চোখের মাথা খেয়েছে বলে হয়নি আজো স্নান
সমুদ্রকে দেখেনি সাক্ষাতে।
অথচ দেখে হাজার চূড়া স্বর্গ ভেঙে নাচে,
আকাশ নেই তবুও তারা জ্বলে ;
বুঝলো না সে সমুদ্রের তটেই বসে আছে
সামনে ঢেউ তুফান তারই কোলে !
প্রতিপলেই ছেঁড়া চটির ত্রস্ত দাঁড় ঠেলে
জাহাজ চলে দেখেও দেখছে না

লবণ-হাওয়া জ্বলছে চোখে, মনের দিশা মেলে
চোখের ভুল তবুও ভাঙছে না।

জানিনা কেন ময়নামতী মেয়েটা এত বোকা
মনটা তার মজেছে ফুটপাথে,
হলোনা আজও নতুন করে নতুন ঘরে ঢোকা
সন্ধ্যাদীপ জ্বলেনা তার হাতে ॥

ক্লেরিহিউ ● অন্নদাশংকর রায়

আচার্য জগদীশ বসু
উদ্‌ভিদ্‌কে বলছেন পশু
নতুন কথা এমন কী
অবাক হওয়াই আশ্চয্যি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এবার যাচ্ছেন পাকুড়।
চায়না কিংবা পেরুনা
সেইখানেই তো করুণা।

শরৎ চন্দ্র চাটুয্যে
মৌন আছেন মাধুর্যে।
সৃষ্টি এখন সবাক তাঁর।
মঞ্চ পর্দা বেবাক তাঁর।

পণ্ডিত জবাহরলাল
নীলকে করবেন লাল।
তা শুনে ভাবে যত নীল
কান যে নিয়ে যায় চিল।

শ্রীমান সমরেশ সেন
পড়েছি যা লিখেছেন।
মনে হয় সমরেশ সেন
লিখেছেন যা পড়েছেন।

শ্রীমতী অনামিকা দে
কেমন মধুর নাচে সে।
সব কটি ভালো ভালো মে'
সকলের হয়ে গেছে বে'।

সবার আমি ছাত্র ● সুনির্ম্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে,
কর্ম্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান, হই যেন ভাই মৌন মহান
খোলা মাঠের উপদেশে প্রাণ-খোলা হই তাইরে॥

সূর্য্য আমায় মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে মিঠে, মধুর কথা বলতে।

ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর   অন্তর হোক রত্ন আকর,
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে ॥

মাটির কাছে সহিষ্ণুতার পেলাম আমি শিক্ষা
আপন কাজে কঠোর হতে পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরণা তাহার সহজ তানে,   গান জাগালো আমার প্রাণে,
শ্যাম বনানী সরসতা আমায় দিল ভিক্ষা ॥

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র,
নানা ভাবের নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়,   পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়,
শিখছি সে সব, লজ্জা দ্বিধা নেইকো কণামাত্র ॥

হয়ত' ● কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

হয়ত' আমার এ পথে আর
হবে নাক আসা,
দুধারে যাই রোপণ করে
বুকের ভালবাসা।

ধূলার এ পথ যাই ভিজায়ে,
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে,
অমল ক'রে যাই রেখে যাই
ক্ষণিক কাঁদা-হাসা।

২

সরায়ে দিই পথের কাঁটা
ছড়ায়ে যাই ফুল,
নিকায়ে যাই স্নেহের বেদী
ছায়া-তরুর মূল।

মমতা মোর পথের কীট ও
পায় যেন হায় পায় যেন গো,
বন-বিহগের কণ্ঠে আমার
অমর হউক ভাষা।

৩

ভক্তি-বিহীন সম্বল হীন
দুঃখী অকপট,
শক্তি নাহি গড়তে দেউল,
সান্ত্বনারি মঠ।

দরদী এই দীনের হিয়া
নিঝরে থাক প্রণয় দিয়া,
হয়ত' কোন তৃষিতেরি
মিটতে পারে তৃষা।

৪

জানিনা এ মানব জনম
আবার পাব কিনা,
নিরুদ্দেশের যাত্রী-রাখি
প্রণয়-রাখীর চিনা।

অনুভূতির ছিন্ন সূত্র
যাই রেখে যাই যত্র তত্র,
পারবে না যা করতে পরশ
কালের কর্ম্মনাশা।

৫

হয়ত' কারো হরবে ক্ষুধা
আমার তরুর ফল,
স্নিগ্ধ কারো করবে দেহ
অশ্রু-দীঘির জল।

ঝরা ফুলের গন্ধে ওরে
হয়ত' কেহ স্মরবে মোরে
ভাবুক পথিক বলবে হেসে
লোকটা ছিল খাসা।

আকিঞ্চন ● কালিদাস রায়

দুঃখ যদি দিতে হয় দাও তবে দয়াময়
নিয়ে গিয়ে এমন ভুবনে—
যেখানে আনন্দ-গান, উৎসবের কলতান
সারাদিন না পশে শ্রবণে।
যেথা নিত্য নাহি হেরি সতত আমারে ঘেরি
উল্লাসের চল-নৃত্য চলে ;
যেখানে সম্ভোগ-মুখ গবাক্ষে বাড়ায়ে মুখ
ব্যঙ্গ নাহি হানে পলে পলে।
যেখানে ফোটেনা ফুল, সুকণ্ঠ বিহঙ্গকুল
গাহে না এমন মধু গান,
চাঁদের আদর পেয়ে সোহাগে গিরির মেয়ে
নাচিয়া তুলে না কলতান।
সুখ যদি দিতে হয়, দাও তবে দয়াময়,
নিয়ে গিয়ে এমন জগতে—
যেখানে না শুনি যেন করুণ-কাতর হেন
আর্ত্তনাদ হায় পথে পথে !
সেথা যেন চারিধারে গৃহগুলি হাহাকারে
উল্লাসের ধিক্কার না হানে ;
যেন কাঙালিনী মেয়ে দ্বারে নাহি রয় চেয়ে
আমাদের উৎসবের পানে।

হয়ে তরু-বুকহারা মুকুলিত লতিকারা
সেথা যেন ভূমে না লুটায়।
ফুল যেন নাহি ঝরে, নদী যেন নাহি মরে,
ঋতুরাজ পাখা না গুটায়।

অশোকতরু ● দেবেন্দ্রনাথ সেন

হে অশোক, কোন রাঙ্গা-চরণ চুম্বনে
মর্মে মর্মে শিহরিয়া হ'লি লালে লাল?
কোন দোল-পূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ, প্রকৃতি দুলাল?
কোন চির সধবার ব্রত উদ্‌যাপনে—
পাইলি বাসন্তী শাড়ী সিন্দুর বরণ?
কোন বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
একরাশি ব্রীড়া হাসি করিলি চয়ন?
বৃথা চেষ্টা! হায়! এই অবনী মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর-তরু-জীব-প্রাণী!
পরাণে লাগিয়া ধাঁ ধাঁ আলোক-আঁধারে
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক কাহিনী!

শৈশবের আবছায়ে শিশু 'দেয়ালা'—
তেমনি অশোক তোর লালে লাল খেলা।

রূপাই ● জসীমউদ্দিন

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,—
কালো মুখেই কালো ভ্রমর! কিসের রঙীন ফুল?
কাঁচা-ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া;
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি-লাউয়ের ডগার মত বাহু দু'খান সরু;
গা' খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল-তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলী-মেঘে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল্।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়ত' কোনো চাষী
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়!
সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার?
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার!
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারি পদ-রজের লাগি লুঠায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ;
কালোবরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।

যে কালো তা'র মাঠেরি ধান, যে-কালো তা'র গাঁও,
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
'জারী'র গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দী' বেত যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়,—"ছেলে নয় ও 'পাগাল' লোহা যেন!
রূপাই যেমন বাপের বেটা, কেউ দেখেছে হেন?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই,—রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।"

প্রিয়তমাসু ● সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

সীমান্তে আজ আমি প্রহরী।
অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম ক'রে
আজ এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি—
স্বদেশের সীমানায়।
ধূসর তিউনিসিয়া থেকে স্নিগ্ধ ইতালী,
স্নিগ্ধ ইতালি থেকে ছুটে গেছি বিপ্লবী ফ্রান্সে
নক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত নিয়তির মতো
দুর্নিবার, অপরাহত রাইফেল হাতে :
—ফ্রান্‌স থেকে প্রতিবেশী বার্মাতেও
আজ দেহে আমার সৈনিকের কড়া পোষাক,

হাতে এখনও দুর্জয় রাইফেল।
রক্তে রক্তে তরঙ্গিত জয়ের আর শক্তির দুর্বহ দম্ভ,
আজ এখন সীমান্তের প্রহরী আমি।
আজ কিন্তু নীল আকাশ আমাকে পাঠিয়েছে আমন্ত্রণ,
স্বদেশের হাওয়া বয়ে এনেছে অনুরোধ,
চোখের সামনে খুলে ধরেছে সবুজ চিঠি :
কিছুতেই বুঝিনা কী করে এড়াবো তাকে ?
কী করে এড়াবো এই সৈনিকের কড়া পোষাক ?
যুদ্ধ শেষ। মাঠে মাঠে প্রসারিত শান্তি,
চোখে এসে লেগেছে তারই শীতল হাওয়া,
প্রতি মুহূর্তে শ্লথ হয়ে আসে হাতের রাইফেল
পা থেকে খসে পড়তে চায় এই কড়া পোষাক,
রাত্রে চাঁদ ওঠে : আমার চোখে ঘুম নেই।
তোমাকে ভেবেছি কতোদিন,
কতো শত্রুর পদক্ষেপ শোনার প্রতীক্ষার অবসরে,
কতো গোলা ফাটার মুহূর্তে।
কতোবার অবাধ্য হয়েছে মন, যুদ্ধ জয়ের ফাঁকে ফাঁকে।
কতোবার হৃদয় জ্বলেছে অনুশোচনার অঙ্গারে
তোমার আর তোমাদের ভাবনায়।
তোমাকে ফেলে এসেছি দারিদ্র্যের মধ্যে'
ছুঁড়ে দিয়েছি দুর্ভিক্ষের আগুনে,
ঝড়ে আর বন্যায়, মার আর মড়কের দুঃসহ আঘাতে
বার বার বিপন্ন হয়েছে তোমাদের অস্তিত্ব।
আর আমি ছুটে গেছি এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর এক যুদ্ধক্ষেত্রে।

জানি না আজো, আছো কি নেই,
দুর্ভিক্ষে ফাঁকা আর বন্যায় তলিয়ে গেছে কিনা ভিটে
জানিনা তাও।
তবু লিখছি তোমাকে আজ : লিখছি আত্মম্ভর আশায়
ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে।
জানি, আমার জন্যে কেউ প্রতীক্ষা করে নেই
মালায় আর পতাকায়, প্রদীপে আর মঙ্গল ঘটে ;
জানি, সম্বর্ধনা রটবে না লোক লোক মুখে,
মিলিত খুশীতে মিলবে না বীরত্বের পুরস্কার।
তবু, একটি হৃদয় নেচে উঠবে আমার আবির্ভাবে
সে তোমার হৃদয়।
যুদ্ধ চাইনা আর, যুদ্ধ তো থেমে গেছে :
পদার্পণ করতে চায়না মন ইন্দোনেশিয়ায়।
আর সামনে নয়,
এবার পেছনে ফেরার পালা।

পরের জন্য যুদ্ধ করেছি অনেক,
এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে।
প্রশ্ন করো যদি এতো যুদ্ধ করে পেলাম কী ? উত্তর তার—
তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়—,
ইতালীতে জনগণের বন্ধুত্ব,
ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র ;
আর নিষ্কণ্টক বার্মায় পেলাম ঘরে ফেরার তাগাদা।
আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,

যে সন্ধ্যায় রাজপথে পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ,
নিজের ঘরেই জ'মে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।

নরক ● সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অন্ধকারে নাহি মিলে দিশা॥
দীর্ঘায়িত নিশা।
বয়োস্ফীত বারাঙ্গনা-পারা
দুর্গম তীর্থের পথে হ'য়ে সঙ্গীহারা
ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথের অজানার পাশে
দুর্মর অভ্যাসে।
কেশকীটে ভরা তার মাথা
লুটায় আমার কাঁধে, পরনের শতচ্ছিদ্র কাঁথা,
বিষায় জীবন বায়ু সংকীর্ণ কুটিরে,
তাহার বিক্ষিপ্ত বাহু ধরিয়াছে মোর কণ্ঠ ঘিরে,
ক্ষণে ক্ষণে
অজ্ঞাত দুঃস্বপ্ন তার সন্ত্রস্ত কম্পনে
সঞ্চারিত হয় মোর জাতিস্মর অবচেতনায়॥

অতন্দ্রিত চক্ষু কিছু দেখিতে না পায়;
শুধু মোর সংকুচিত কায়া
অনুভব করে যেন নামহীন কাহাদের ছায়া
শিয়রে সংহত হয়ে ওঠে;

কোন যাত্নঘর হতে দলে-দলে পাশে এসে জুটে
অবলুপ্ত পশুদের ভূত
কুৎসিত অদ্ভুত।
অমূর্ত আকাংখ্যা হাসি, নিরাকার লজ্জা অসন্তোষ,
অসিদ্ধ হুরাশা দম্ভ, নিষ্ফল আক্রোশ
কানাকানি করে অন্তরালে।
রন্ধ্রহীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে
অতিক্রান্ত বিলাসের, অবস্থার প্রমোদের শব
অনুর্বর সম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
জোগায়ে জীয়ন রস অপুষ্পক বীজে ॥
অয়ি মনসিজে,
কোথা তুমি কোথা আজ এই স্থূল শরীরি নিশীথে ?
তোমার অতল, কালো, অতনু আঁখিতে
তারকার হিম দীপ্তি ভরে
তাকাও আমার মুখে। অনাত্মীয় অসিত অম্বরে
এলাও অস্পৃশ্য কেশ সূক্ষ্ম নিরুপম,
স্বপ্ন স্বচ্ছ বরাভয়ে আত্মত্যাগী বেরেনিকে-সম।
হেমন্ত হাওয়ার নিমন্ত্রণে
অনঙ্গ আত্মারে মোর ডাক দাও নীহার শয়নে
দুস্তর নাস্তির পরপারে,
দাঁড়ায়ে যে নির্ব্বাণের নির্লিপ্ত কিনারে
নিরুদ্বেগ নচিকেতা দেখেছিলো অধোমুখে চাহি
সম্ভোগ রাত্রির শেষে ফেনিল সাগরে অবগাহি
কষিত-কাঞ্চন কান্তি নগ্ন বসুন্ধরা

তারই প্রলোভনতরে সাজায়িছে যৌবন পশরা
রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে, কামাতুর রামার সমান,
হে বৈদেহী, করো মোরে সেখানে আহ্বান ॥

পণ্ডশ্রম, নাহি মিলে সাড়া ;
শূন্যতার কারা
অগোচর অবরোধে ঘিরে মোর আর্ত্ত মিনতিরে ;
যতই পলাতে চাই অভেদ্য তিমিরে
মাথা ঠুকে রক্তপঙ্কে পড়ি,
অগ্রজের মৃত দেহ যায় গড়াগড়ি
ক্রিমিভোগ্য—দুর্গন্ধ যেখানে,
চরে যেথা ক্ষয়স্তূপে ভোজ্যের সন্ধানে
ক্লেদপুষ্ট সরীসৃপ, স্বেদস্রাবী বক্র বিক্র বিষধর,
পঙ্কিল মণ্ডূক আর মূষিক তস্কর,
বজ্রনখ পেচক, বাদুড় ।

বমন বিধুর
আমার অনাত্ম্য দেহ পড়ে আছে মৃণ্ময় নরকে ।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধ্নু নিশাচর ।
দুস্তর, দুস্তর, জানি, শাস্তি মোর দুঃসহ, দুস্তর ।
মনে হয় তাই
আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসংকল্প মৌখিক বড়াই,
জীবনের সারকথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,

নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী ;
তাহার বিখ্যাত রাখি,
সে নহে মঙ্গলসূত্রে, কেবল কুটিল নাগপাশ ;
মলময় তাহার উচ্ছ্বাস
বোনে শুধু ঊর্ণাজাস অসতর্ক মক্ষিকার পথে ॥

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দ্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে ॥

ব্যাপ্ত মোর-চতুর্দ্দিকে অনন্ত আমার পটভূমি ;
সবই সেথা বিভীষিকা, এমন কি বিভীষিকা তুমি ॥

আমাদের বুদ্ধি আজ ● জীবনানন্দ দাশ

আমাদের বুদ্ধি আজ অন্তহীন মরুচর, তাই
প্রাণে শুধু-বিষয়ের নিত্য দাহ আছে।
তার শান্তি সময়ের সাগরের কাছে
হয়তো বা পাওয়া যেতে পারে ;
কিন্তু কোন সময়ের দিকে যেতে হবে ?
শূন্যের ভিতরে ফল যেখানে রয়েছে মনে হয় ?
অথবা যে-দিকে গিয়ে হৃদয় ক্রমেই
শান্ত হয়ে টের পাবে শূন্য ছাড়া আর কিছু নেই ?
তবুও সূচনা থেকে যাত্রা ক'রে কোনো প্রান্তে যাওয়া
ভালো ; কোথাও চিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে
বৃক্ষ নদী কুজঝটিকা রক্তের আকাশ শতাব্দীর ভাঙা বাটখারা ;
মূল্য নির্ণয়ের কাজে উঠছে পড়ছে—
ঘর বাড়ি সাঁকো নীড় ঘাস
ক্রেন এরিয়েল ট্রেন—গুণচট চালানির মাল
যে-সাগর রোদে চলে—তবু কালো কুয়াশাকে আলো
মনে ভবে অনাবিল ভাবে চলে
বেতার কম্পাশ বাষ্প কলকব্জা হাল মাস্তুলের
হাড়গোরে বুক ভ'রে কর্মোৎসাহী ব্যাপারীর মতো
সোনা রুপো চলতি বাজারদর জানার ও জানবার বেগে,
চ'লে যায় অন্ধকার ভেদ ক'রে

অদ্ভুত আবছা মূর্তি বুকে টেনে নিয়ে
বদ্বীপ ও বন্দরের দিকে,
চেতনার সে-রকম চলা হল ঢের।
দূর কাঁটা কম্পাশের দিক চিহ্ন আজ
ক্রমায়াত শূন্যে বিলীন?
একদিন যা কিছু স্পষ্ট মনে হয়েছিল
সে-সব এখন আর স্থির
নির্ধারিত সত্য নয়;
আলো বেড়ে গেছে; আবছায়া আরো
বেড়ে গেছে;
আলো আরো বাড়ালে ভয়াল পতঙ্গ সব ঘিরে রবে;
শত্রুদের দণ্ড আরো বেড়ে যাবে;
অনিশ্চিত বড় অন্ধকার সব দেখা যাবে;
হয়তো আগুনে পরিণত হয়ে যাবে আলো।—
হে হৃদয়, তবুও আঁধারদর্শী চেতনাবলের দরকার।
দূর থেকে আরো দূরে যাত্রার প্রয়োজন আছে।
ভুল ছেড়ে অন্য-এক শুদ্ধ কেন্দ্রে গিয়ে—
তাও ঠিক শুদ্ধ নয়—কী হবে দাঁড়িয়ে।
জন্মের আগে যেই কুজঝটিকা ছিল,
মৃত্যুর পরে যেই অন্ধকার নিঃশব্দতা রবে,
সেই সব কিছু নয়;—
জেনে মন চলেছে নতুন সূর্যে. দিকনির্ণয়ে,
কিছু সূর্য—ঢের বেশি ছায়া-দিয়ে হৃদয়কে ভ'রে
মধ্যবয়সী প্রৌঢ় স্থবির আত্মার বর্ণে বার-বার সূর্য ভেঙে গ'ড়ে।

জন্ম ● হুমায়ুন কবীর

কেন জন্ম হল মম তাই বসে ভাবি আজ মনে।
ফাল্গুন উতলা প্রাণে পুষ্প-সম কেন অকারণে
উঠেছিনু ফুটি মম জননীর কোলে? দুঃখে সুখে
দিবস রজনী শুধু আনিবারে চলেছি সম্মুখে।
প্রভাত আলোক আজি অন্ধকার মেঘের মালায়,
বহিছে উত্তর বায়ু, সঙ্গীহীন এ বন্দিশালায়
কে নিষ্ঠুর ফেলেছিল অসহায় শিশুটিরে টানি,
কিসের লাগিয়া? ধরণীর ধূলিতলে শিরহানি,
শুধাই উত্তর তার। কেহ কিছু কহে নাকো আসি;
কঠিন পাষাণে লাগি ফিরে আসে তিক্ত অশ্রুরাশি,
না বুঝিয়া ব্যথা ভরে কেঁদে ওঠে সারা দেহমন,
জীবনে আঁধার নামে, নিভে যায় আকাশ তপন।
কেন জন্ম লভেছিনু নাহি জানি, শুধু জানি মনে
জন্মিতে চাহিনি কভু। কেন অনাদরে অকারণে
ধরাতলে বিকশিল জীবন আমার? অর্থ খুঁজি,
চিত্ত মম পরিশ্রান্ত। তবু জানি, বুঝি নাহি বুঝি,
আমারে চলিতে হবে দিবানিশি সম্মুখের পানে,
অনন্ত আঁধার ভেদি কোথা কোনো আলোর সন্ধানে।
আলো কি কোথাও আছে? তাহা নাহি জানে হিয়া মোর,
শুধু জানে চারিদিকে অন্ধকারে বহে অশ্রুলোর,—

দারিদ্র্য যাতনারাশি, ক্ষুধিতের ক্ষুধার বেদনা,
বঞ্চিতের ক্ষুব্ধ রোষ, অন্যায়ের পুঞ্জ আবর্জ্জনা
জন্মিয়াছে যুগে যুগে। এই মৃত্যু নরকের মাঝে
স্বরগ আনিতে হবে যে স্বপন-স্বরগ বিরাজে
সকল জাগ্রত স্বপ্নে। সেই স্বর্গ কভু কি আসিবে,
তিমির রজনী শেষে পূর্ব্বাচলে অরুণ হাসিবে ?

পরপারের কামনা ● গোলাম মোস্তফা

নিখিলের এত শোভা, এত রূপ এত হাসি গান
ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন প্রাণ!
এ বিশ্বের সবই আমি প্রাণ দিয়ে বাসিয়াছি ভালো,
আকাশ, বাতাস, জল, রবি, শশী, তারকার আলো।
সকলেরি সাথে মোর হয়ে গেছে বহু জানাশোনা,
কত কি যে মাখামাখি কত কি যে মায়ামন্ত্র বোনা!
বাতাস আমারে ঘিরে খেলা করে মোর চারিপাশ,
অনন্তের কত কথা কহে নিতি নীলিম আকাশ।

চাঁদের মধুর হাসি, বিশ্বমুখে পুলক-চুম্বন,
মিটিমিটি চেয়ে-থাকা তারকার করুণ নয়ন ;
বসন্ত নিদাঘ শোভা, বিকশিত কুসুমের হাসি,
দিকে দিকে শুধু গান, শুধু প্রেম ভালোবাসাবাসি ;
বরষার বারিধারা, চমকিত চপলা দামিনী,
শরতের শান্ত সিত পুলকিত মধুর যামিনী,

হেমন্তের সঙ্কুচিত দূর্বাদলে নিশির শিশির,
শীতের শীতল বায়ু, হিম-ভরা নদ-নদী-নীর ;
প্রকৃতির নগ্ন শোভা, শস্যময় শ্যামল প্রান্তর
গ্রাম্য-গীতি-মুখরিত কৃষকের সরল অন্তর ;
প্রতিদিন নানাভাবে নিতি নব বিশ্বপরিচয়,
প্রতিদিন এত কাজ, এত কথা, এত অভিনয়—
সকলি বিফল হবে ? সকলি কি হবে ভুল দেখা ?
সকলি কি স্বপ্নময় মায়াময় ছায়া দিয়ে লেখা ?
সকলি ছাড়িয়া যাব ? এ জগৎ পড়ে রবে পিছু ?
আর আমি দু'নয়নে এ বিশ্বের হেরিবনা কিছু ?
মরণ কি টেনে দেবে আঁখি-কোণে অন্ধ আবরণ ?
এ-পার ও-পার মাঝে রবে নাকো স্মৃতির বন্ধন ?
হে বিরাট তব পাশে আজি মোর এই নিবেদন—
প্রভু তুমি কৃপা করি ইচ্ছা মোর করিও পূরণ—
মরণের পরপারে যেই বেশে, সেই দেশে যাই,
তোমার আকাশ আলো তবু যেন দেখিবারে পাই,
নিখিলের এই শোভা, এই হাসি, এই রূপরাশি,
মরিয়াও আমি যেন প্রাণ দিয়ে সবে ভালবাসি'।

দরিদ্র ● চিত্তরঞ্জন দাশ

অনেক সৌন্দর্য্য আছে হৃদয় ভরিয়া,
সহস্র মাণিক্য জ্বলে অন্তর আঁধারে ;
অনন্ত সঙ্গীত রাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দিবস-রজনী করে উন্মাদ আমারে।

গাহে পাখী, বহে বায়ু, বসন্তের মত,
নানাবর্ণে শত পুষ্প ফুটে মনোবনে ;
জগতের কাছে তবু দরিদ্র সতত
মরমে মরিয়া থাকি আপনার মনে।

তোমরা ডেকেছ তাই আনিয়াছি আজ,
ভাষায় গাঁথিয়া পুষ্প মন-মালঞ্চের ;
তোমরা দেখেছ শুধু বাহিরের সাজ,
সৌন্দর্য্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের।

হৃদয়-সম্পদ্ রাশি ফুটে না ভাষায়,
বাহিরে আনিলে সব সৌন্দর্য্য হারায় ॥

অশ্রুমুকুল ● শৈলেন্দ্রনাথ গোস্বামী

এই চাঁদনী নিশি কোথা ব্রজের শশী
রাসমঞ্চ কেন
শূন্য সখি ?
মোর বরজ নারী কুল মান ছাড়ি
এই কুঞ্জে বল
আর কেমনে থাকি ?
ঐ নীপ মূলে শিখি পুচ্ছ তুলে
নাচে তাথিয়া থিয়া
সব শঙ্কা ভুলে
ধায় যমুনা ধণি তুলি বিধুর ধ্বনি,
তার বিফল বুকের
ব্যথা চাপিয়া কূলে।
যদি ব্রজের কালা করে নিঠুর ছলা
হানে বাজ শিরে—
সখি জান অবলা —
তবে মল্লিকা ডোর কর ছিন্ন উজোড়
বল মনের কথা
যাহা যায় না বলা ॥

মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ ● সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১

আরে! মুখুজ্যে মশাই যে! নমস্কার, কী খবর?
আর এই লেখা-টেখা সংসার-টংসার এই নিয়েই ব্যস্ত
তা বেশ। কিন্তু দেখো মুখুজ্যে,
আমার এই ডানদিকটাকে বাঁদিক
আর বাঁ দিকটাকে ডানদিক করে
আয়নায় এভাবে আমাকে ঘুরিয়ে দেওয়া—
আমি ঠিক পছন্দ করিনা।
তার চেয়ে এসো, চেয়ারটা টেনে নিয়ে
জানলায় পা তুলে বসি।
এক কাপ চায়ে আর কতটা সময়ই বা যাবে?

দেশলাই? আছে?
ফুঃ, এখনও সেই চারমিনারেই রয়ে গেলে!
তোমার কপালে আর করে খাওয়া হল না দেখছি।
বুঝলে মুখুজ্যে, জীবনে কিছুই কিছু নয়
যদি কৃতকার্য না হলে।

২

আকাশে গুড় গুড় করছে মেঘ—
ঢালবে।
কিন্তু খুব ভয়ের কিছু নেই ;
যুদ্ধ না হওয়ার দিকে।
আমাদের মুঠোয় আকাশ ;
চাঁদ হাতে এসে যাবে।
ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির,
অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই
পাল্লা ভারী হচ্ছে।
ঘৃণার হাত মুচড়ে দিচ্ছে ভালবাসা।
পৃথিবীর ঘর আলো করে—
দেখো, আফ্রিকার কোলে
সাত রাজার ধন এক মাণিক
স্বাধীনতা।
পাজীর পা-ঝাড়াদের আগে যারা কুর্ণিশ করত
এখন তারা পিস্তল ভরছে।
শুধু ভাঙা শেকলগুলো এক জায়গায় জুটে
এই দিনকে আবার রাত করবার কড়ারে
ডলারে ফলার পাকানোর
ষড়যন্ত্র আঁটছে।
পুরণো মানচিত্রে আর চলবে না হে,
ভূগোল নতুন করে শিখতে হবে।

আর চেয়ে দেখো,
এক অমোঘ নিয়মের লাগাম-পরা
ঘটনার গতি
পাঁজির পাতায় রাজ জ্যোতিষীদের
দৈনিক বেইজ্জত করছে।

ধনতন্ত্রের বাঁচবার একটাই পথ
আত্মহত্যা।
দড়ি আর কলসী মজুত
এখন শুধু জলে ঝাঁপ দিলেই হয়।
পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে সাজাতে
ভবিষ্যৎ কথা বলছে শোনো,
ক্রুশ্চেভের গলায়।

নির্বিবাদে নয়, বিনা গৃহযুদ্ধে
এ মাটিতে
সমাজতন্ত্র দখল নেবে।
হয়তো একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে
কিন্তু যখন হবে
তখন খাতা খুলে দেখে নিও
অক্ষরে অক্ষরে সব মিলে যাচ্ছে।

৩

দেখো মুখুজ্যে, মাঝে মাঝে আমার ভয় করে
যখন অমন সুন্দর বাইরেটা
আমার এই অগোছালো ঘরে হারিয়ে যায়।

যখন দেখি ঠিক আমারই মতো দেখতে
আমার দেশের কোনো ভাই
উলিঝুলি ছেঁড়া কাপড়ে
আমাকে কাঁদাতে পারবে না জেনেও
বলে বলে দুঃখের কথাগুলোতে ঘাঁটা পড়ায়—
আমার লজ্জা করে।

পাঞ্চেতের এক সাঁওতাল কুলি দেখতে দেখতে
ওস্তাদ ঝালাই মিস্ত্রী হয়েছিল
এখন আবার তাকে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে পেট ভাতায়
পরের জমিতে আদ্যিকালের লাঙল ঠেলতে হচ্ছে।
এক জায়গায় রুগী ডাক্তার অভাবে মরছে
অন্য জায়গায় ডাক্তার রুগী অভাবে মরছে।
কেন হয়?
কেন হবে?

আমি দেখে এসেছি নদীর ঘাড় ধরে
আদায় করা হচ্ছে বিদ্যুৎ।
ভালো কথা।
কলে তৈরী হচ্ছে বড় বড় রেলের ইঞ্জিন।
খুব ভালো।
মশা মাছি সাপ বাঘ তাড়িয়ে
ইস্পাতের শহর বসছে—
আমরা সত্যিই খুশী হচ্ছি।

কিন্তু মোটেই খুশী হচ্ছি না যখন দেখছি—
যার হাত আছে তার কাজ নেই
যার কাজ আছে তার ভাত নেই
আর যার ভাত আছে তার হাত নেই।

তবু যদি একটু পালিশ থাকত!
তা নয়,
মুচির দোকানের লাশে-চড়ানো জুতোর মত
মাথার ওপর ঝুলছে।

গদিতে ওঠ-বস করাচ্ছে
টাকার থলি।
বন্ধ মুখগুলো খুলে দিতে হবে
হাতে হাতে ঝন্ ঝন্ করুক।
বুঝলে মুখুজ্যে, সোজাসুজি চলবে না
আড় হয়ে লাগতে হবে।

৪

যারা হটাবে
তারা এখনও তৈরি নয়।
মাথায় একরাশ বইয়ের পোকা
কিল বিল করছে,
চোখ খুলে তাকাবার
মন খুলে বলবার

হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখবার—
মুখুজ্যে, তোমার সাহস নেই।
আগুনের আঁচ নিভে আসছে
তাকে খুঁচিয়ে গন্‌গন্‌ করে তোলো।
উঁচু থেকে যদি না হয়
নিচে থেকে করো।

সহযোদ্ধার প্রতি যে ভালোবাসা একদিন ছিল
আবার তাকে ফিরিয়ে আনো;
যে চক্রান্ত
ভেতর থেকে আমাদের শিবিরকে কুরে কুরে খাচ্ছে
তাকে নখের ডগায় রেখে
পট্‌ করে একটু শব্দ তোলো।

দরজা খুলে দাও,
লোকে ভেতরে আসুক।

মুখুজ্যে, তুমি লেখো।

অশ্বত্থ ● বিষ্ণু দে

গাছের স্তব্ধতা গড়ি দেহে মনে
মহাপিপুলের, আকাশে রোমাঞ্চ মেলে রাখে
সহস্রাক্ষ যে পিপুল, অটল স্তব্ধতা দেখি তার সনাতনে
মনে মনে গড়ি,

রাঢ়ের রুক্ষতা জয় করে যে পল্লবে
লক্ষ লক্ষ প্রাণময় সবুজ পল্লবে ঢাকে
আপন হৃদয়,

কঠিন সংহত স্থির সারাটা প্রান্তরে প্রাণের গঠন,
অজেয় উৎসবে কোনও উমার সন্ধানে
যেন বা এসেছে দেশে সতীর গিরিশ।
পিঙ্গলে তন্ময় দেহমন।

ওদিকে তুলেছে কারা মহানিম আমজাম ছাতিম শিরীষ
নানা ফুল ফল গাছ নানা শব্দ গানে
ঝিরি ঝিরি নানা নাচে
নরম হাওয়ায়
সব ভালো খুব ভালো, মধুর মধুর, আনন্দ আরাম তৃপ্তি ;
তবু অতুলন এই বয়স্ক পিপুল, রৌদ্রে স্থির,
পৃথুল প্রবীণ পৃথিবীর বিপুল প্রণয়ে স্তব্ধ।

কখনও বা অনেক কূজনে কচি কচি লক্ষ লক্ষ কোমল সবুজ
হাতে হাতে মৃদু পাতা শিহরে শিহরে দোলে,
যেন কোনও আন্দোলনে পরগণার সমস্ত মাতার
কোলে কোলে স্পষ্টে আর অস্পষ্টে অবুঝ শিশুদের ভীড়,
কখনও বা ঈশানের ঝড়ে
উদ্দাম উন্মাদ রাগে হাহাকারে মারে মরে
নুয়ে বেঁকে পড়ে, বাসা ছাড়ে, তালে তার তাল দেয়—
পাখায় পাখায়,

ভাঙে না, কারণ তার আবিশ্ব শিকড়ে সনাতনে
গভীর কঠিন প্রাণ, বড় জোর বহুদূরে পাঁচিলের ভিড়ে
উপড়িয়ে ওঠে তার দুর্মর আবেগ, ফাটল ধরায়,
ধসায় দেয়াল, বড় জোর ঝরায় পল্লব কিছু, কিছু বা খসায় ডাল,
তারপরে আবার আত্মস্থ,
আকাশ ও নীড়,
স্তব্ধ স্থির আমাদের মাঠে আশ্চর্য্য অশ্বত্থ গাছ ॥

এক ঝাঁক পায়রা ● বিমল চন্দ্র ঘোষ

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্য্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে,
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে।
নিঃস্বীম ঘন নীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।
হে কাল হে গম্ভীর
অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ,
হে অসীম উদাসীন বারোমাস!

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা।

দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি
এক ফালি নাগরিক আকাশে
কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে--
চৈতালি সূর্য্যের থমথমে রৌদ্রে
জীবন্ত উল্লাসে উড়ছে
পাঁচরঙা এক ঝাঁক পায়রা।

এক ফালি আকাশের কোল-ঘেঁষা কার্ণিশ
রংচটা গম্বুজ, দিগন্তে চিমনি,
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখনায়
ছোট্ট কালের ঘোরে প্রাণ তবু তন্ময়
লীলায়িত বিস্ময়।
সৃষ্টির স্বাক্ষর এক ঝাঁক পায়রা।

রূপালি পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ
দুপুরের ঝলমলে রোদ্দুর,
হে কপোত, পারাবত, পায়রা
যেদিকে দু'চোখ যায় দেখা যায় যদ্দূর
রূপালি পাখায় আঁকা শূন্য।
আকাশী ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

রুমির ইচ্ছা ● নরেশ গুহ

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি বুলবুল হাঁস
মৌমাছি হই একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই,
ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের ভূগোলের ক্লাশ।

তবে আমি টুপটুপ নীল হ্রদে দিই ডুব রোজ
পায়না আমার কেউ খোঁজ!
তবে আমি উড়ে উড়ে ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক ভোজ।

হোক আমার এলোচুল, তবে আমি হই ফুল লাল,
ভ'রে দিই ডালিমের ডাল।
ঘড়িতে দুপুর বাজে, বাবা ডুবে যান কাজে,
তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল।

মায়াতরু ● অশোক বিজয় রাহা

এক-যে ছিল গাছ,
সন্ধ্যে হ'লেই দু-হাত তুলে জুড়তো ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠতো যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করতো সে গরগর
বৃষ্টি হলেই আসতো আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠতো হেসে
কোথায় বা সেই ভালুক গেলো, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষহীরার মাছ।

ভোর বেলাকার আবছায়াতে কাৎ হতো কী-যে
ভেবে পাইনে নিজে,
সকাল হ'লো যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকির মিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর।

মেঘদূত ● সমর সেন

পাশের ঘরে
একটি মেয়ে ছেলে-ভুলানোর ছড়া গাইছে,
সে ক্লান্ত সুর
ঝরে যাওয়া পাতার মত হাওয়ায় ভাসছে,
আর মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে
অন্ধকার আকাশের বনে।

বৃষ্টির আগে ঝড়, বৃষ্টির পরে বন্যা। বর্ষাকালে,
অনেক দেশে যখন অজস্র জলে ঘরবাড়ি ভাঙবে,
ভাসবে মূক পশু আর মুখর মানুষ,
শহরের রাস্তায় যখন
সদলবলে গাইবে দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবক,
তোমার মনে তখন মিলনের বিলাস
ফিরে যাবে তুমি বিবাহিত প্রেমিকের কাছে।
হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,
কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে ?

বৈদান্তিক ● অমিয় চক্রবর্ত্তী

প্রকাণ্ড বন, প্রকাণ্ড গাছ—
বেরিয়ে এলেই নেই।
ভিতরে কত লক্ষ কথা, পাতা পাতায়, শাখা শাখায়
সবুজ অন্ধকার ;
জোনাকি কীট, পাখি পালক, পেঁচার চোখ, বটের ঝুরি,
ভিতরে কত আরো গভীরে জন্তু চলে, হলদে পথ,
তীব্র ঝরে জ্যোৎস্না-হিম বুক-চিরিয়ে,
কী প্রকাণ্ড মেঘের ঝড় বৃষ্টি সেই আরণ্যক,—
বেরিয়ে এলেই নেই।
ভিতরে কত মিষ্টি ফল, তীক্ষ্ণ স্বাদ ফুলের তীর,
ইচ্ছে ভরা বুনো আঙ্গুর, জামের শাঁস,
ভিতরে কত দ্রুতের ভয়, কখনো বেলা সময়হীন—
বেরিয়ে এলেই নেই।
চক্রবাল চোখে রেখেই বাইরে চাই,
গাঁয়ের ধোঁয়া একটু রেখা সন্ধ্যা হলে,
অনাসক্ত নদীর জলে সিক্ত মাটি
বিনা চাষের বুনো ধানের গুচ্ছে রয়,
এখানে সবই বিরলতার।
বুকের মধ্যে বাড়ি যাবার
খুঁজে পাবার এখানে কোনো চিহ্ন নেই ;
দৃষ্টি আছে।

যে লোকটা ● অজিত দত্ত

যে লোকটা বলেছিল, "এদিকে গেলেই
পাবে ঠিক পথের নিশানা"—
নিজেই সে দেখি পথে পথে ঘুরে মরে
সব পথ-কানা।
কত গলি ঘুঁজি ঘুরে বর্ষায় রোদ্দুরে
সব দ্বার, সব জানালায় চিহ্ন রেখে
ভেবেছে সে, একদিন জলে ভিজে
রোদে তেতে পুড়ে,
নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নেবে ঘুরে মরা থেকে।
এখন ঘুমের ক্লান্তি পায়ে তার শিকলের মতো,
তাপ ও তৃষ্ণায় তার দুটি চোখ যেন পোড়া মাটি,
এখন সে সারাদিন খুঁজে ফেরে
গলি ঘুঁজি যত,
কিছুতে পায়না খুঁজে নিজেরি
ঘরের ঠিকানাটি।
যে লোকটা বলেছিল, 'দেখেছি অনেক,
অনেক জেনেছি, জানি বলে দিই
যার দরকার।
এখন নিজেই দেখি নিয়েছে সে ভিখিরীর ভেক
কেবলই শুধায়, 'জানো আমি কার?
আমি কোথাকার?"

কবিতা-চিন্তা ● দিনেশ দাস

॥ কবি ॥

তাঁতীরা যেমন করে গুটিপোকা থেকে
সোনালী রেশমী সুতো কাটে পরপর।
কবিও তেমনি বোনে শব্দের গুটি থেকে
কবিতার রেশমী কাপড়।

॥ কবিতা ॥

একটি কবিতা যেন জড়োয়া গহনা।
ভাবের হীরেটি আছে বোনা
আরেক সোনার কবিতায়,
ভাবের হীরক গাঁথা শব্দের সোনায় ॥

॥ কবি-প্রকৃতি ॥

মানুষে ফানুসে ঘোরে মানুষের মন—
প্রকৃতিকে নিয়ে শুধু কবির জীবন।
মানুষ যে-চোখে চায় মানুষীর দিকে,
কবি সেই চোখ দিয়ে দেখে প্রকৃতিকে ;

॥ কবিতা পড়া লেখা ॥

বুদ্ধির সিঁড়িতে শুধু পাক খাওয়া শিখি,
স্নায়ুর জোরেই যাই পাহাড় পেরিয়ে।
বুদ্ধি নয় : অনুভূতি, স্নায়ুতন্ত্রী দিয়ে
আমরা কবিতা পড়ি, কবিতাও লিখি।

ইলা মিত্র ● গোলাম কুদ্দুস

ইলা মিত্র বাদশাহী জেলে
স্বামী তার শান্ত ঋজু দৃঢ়
ফেরারী এখনো পাকিস্তানে
উভয়ের শিশুপুত্র কোথা
মাতাপিতা—সঙ্গহীন বাড়ে !
এ বেদনা কবি চিত্তে যদি
মাঝে মাঝে আনে ব্যাকুলতা
তবু জেনো প্রকাশের মতো
ভাষা নেই বিদ্যুত সঞ্চারী ।
এ ব্যথা তো ব্যথা নয় শুধু
ব্যথা ভাঙা সংগ্রাম যন্ত্রণা
ফেটে পড়া হৃদয়ের তটে
বন্যাবেগ মহিমা মণ্ডিত !
পূর্ববঙ্গে লোক দেশত্যাগী
তুমি গেলে দেশের গভীরে
কৃষকের হৃদয়ের কাছে ।
"ওঠো জাগো নাচোলের চাষী"
ঘরে ঘরে দিলে তুমি ডাক ।
"জাগো লাল ঝাণ্ডা নিয়ে জাগো !
শঙ্কাহীন জানালে আহ্বান ।

ক্ষুধাতুর ব্যাথাতুর যারা
সাড়া তারা দেয় ধীরে ধীরে
ধীরে ধীরে চেতনা কন্দরে
ঝরে পড়ে আশার আলোক !
বাঁশরীর আনন্দের সুরে
ধীরে ধীরে তোলে তারা মাথা ।
যত জাগে মানুষের প্রাণ
নিদ্রা তত ঘোচে পশুদের ।
ক্রুদ্ধ তারা দিবারাত্রি খোঁজে
ইলা মিত্র — ইলা মিত্র কোথা ?
ইলা মিত্র কৃষকের ঘরে
মিশে যায় কৃষকের মেয়ে
ইলা মিত্র ঘোরে গ্রামে গ্রামে
কৃষকের খুদ কুঁড়ো খেয়ে
ইলা মিত্র খালি পায়ে চলে ।
মেঠো পথে রোদ বৃষ্টি জলে
কে বলিবে পাশকরা মেয়ে !
কোলকাতার স্পোর্টে হয় ফার্ষ্ট !
ইলা মিত্র ইস্পাতের গড়া !
ইলা মিত্র সংগঠন গড়ে !
পুলিশ ঘেরাও করে বাড়ী
দুঃসাহসী মেয়ে অকাতরে
ঝাঁপ দিল কুয়োর ভিতরে !
ক্ষিপ্ত বোকা শিকারীর দল

ফিরে যায় আরো ক্রুদ্ধ হয়ে।
তারপর ছুটে এল তারা
ধান-কাটা নাচোলের মাঠে
বুলেট-বৃষ্টিতে রক্ত ঝরে
নাচোলের শস্যশূন্য মাঠ
পূর্ণ হল কৃষকের লাশে।
ক্ষুব্ধ সাঁওতালের তীর লেগে
পুলিশ মরেছে চারজন
কৃষক যে মরে কত জনা
হিসেবের নেই প্রয়োজন!
চিরকাল যারা শুধু মরে
তারা কেন বাঁচবে এখন?
ইসলামী ন্যায় দণ্ড তলে
ঘাতকের হল না বিচার।
এল তারা দল বেঁধে আরো
চতুর্দ্দিকে দিল বেড়াজাল
ইলা মিত্র পালাবে কোথায়!
খুন-ঝরা নাচোলে সেদিন
একটি নারীর ভয়ে হায়
জেগে ওঠে কত না পৌরুষ!

ইলা মিত্র এ দেশেরই মেয়ে
ইলা মিত্র তবু ভাঙে শাঁখা!
হাত থেকে টেনে খোলে নোয়া

মুছে ফেলে চিহ্ন এয়োতির।
কেশগুচ্ছ ছেঁটে ফেলে দেয়
শাড়ি ছেড়ে পরে সাদা ধুতি
আবেষ্টনি করে অতিক্রম
অতিক্রম করে সমাজের
নারীত্বের শাশ্বত নিয়ম।
তখনও সন্ধ্যার আধোছায়া
ষ্টেশনের চত্বরের পাশে
ট্রেনের সামান্য মাত্র দেরী
আই. বি র গোয়েন্দার চোখে
অকস্মাৎ জ্বলে ক্রূর হাসি,
রাত্রির নিরন্ধ্র কালো এসে
রুদ্ধ করে আলোকের গতি!

প্রথমে থানায় নিয়ে যায়
"বল তোর সঙ্গী সাথী কোথা?"
ইলা মিত্র নির্ব্বাক, নিশ্চুপ।
"কোথায় লুকিয়ে আছে বল?"
ইলা মিত্র নিঃশব্দ কঠিন।
তারপর যে কাহিনী সেটা
ভাই হয়ে বলিব কেমনে?
বস্ত্র গেল, লজ্জা গেল, গেল
যা কিছু যাবার পশুগ্রাসে!
থানার দেওয়ালগুলো যদি

হৃৎপিণ্ড হত যেতে ফেটে !
স্তব্ধ রাত্রি বায়ু গতিহীন
নাচোলের মাঠে তীব্র জ্বালা।
ইলা মিত্র ফাঁসীর আসামী !
লোকারণ্য রাজশাহী কোর্ট !
একটি উকিল মেলা ভার
ওরা ভীত স্বাধীন স্বদেশে
স্ট্রেচারেতে শায়িত একাকী,
ইলা মিত্র বাক্‌শক্তি হীনা,
পাঁজরের হাড় গোড় ভাঙা
মুখে চোখে কপালে ব্যাণ্ডেজ,
রক্তাক্ত আঙুলগুলি কাটা।
তবুও কাগজ টেনে নিয়ে
দুনির্ব্বার ইচ্ছাশক্তি বলে
আত্মপক্ষে করে সমর্থন
হাতে লিখে—রক্তাক্ত অক্ষরে।

"অপরাধী লীগ সরকার !
অপরাধী নুরুল আমিন !
অপরাধী তাহার পুলিশ !
খুনী, তারা, তারা ব্যাভিচারী।
কোর্টে আজ তারাই আসামী !"
তারপর ইলা মিত্র লেখে
একে একে পীড়নের কথা

ঠেলে ফেলে সমস্ত সংকোচ
রাষ্ট্র হোক কুকীর্ত্তি কাহিনী!
ইলা মিত্র মর্ম্মে মর্ম্মে জানে
যৌন নয়, সমস্যা জমির।
তারই সংগে বাঁধা আছে যত
পুরুষের নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা!
নারীর নিকৃষ্ট অপমান!

পুলিশেরা আদালত থেকে
ফিরে যায় মুখ চূর্ণ করে!
ইলা মিত্র স্ট্রেচারে আবার
ফিরে আসে কয়েদ খানায়।
ফেরেনা কাহিনী তবু তার!
বাতাসে ছড়ায় মুখে মুখে,
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে,
দেশ থেকে দেশান্তরে
সীমান্ত পেরিয়ে সেই না'ম
ব্যাপ্ত হয় ভারতের বুকে,
যায় মুক্ত মানুষের দেশে
সেই নাম চীনে সোবিয়েতে।
ছড়ায় স্পেনের কারাগারে।

ইলা মিত্র কৃষকের প্রাণ!
ইলা মিত্র ফুচিকের বোন!

ইলা মিত্র ষ্টালিন নন্দিনী।
ইলা মিত্র তোমার আমার
সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ বিবেক।
ইলা মিত্র দলাদলি, আর
ক্ষুদ্রতার রূঢ় ভর্ৎসনা।
ইলা মিত্র নারীর মহিমা।
ইলা মিত্র বাঙালীর মেয়ে।

ইলা মিত্র বন্দী তবু আজো।
স্বামী তার শান্ত ঋজু দৃঢ়
এখনও ফেরারী পাকিস্তানে,
উভয়ের শিশু পুত্র কোথা
মাতা পিতা সঙ্গহীন বাড়ে।

জন্মান্তর ● বন্দে আলি মিয়া

একটি প্রসন্ন রাত্রি ফিরিবে কি জীবনে আবার
মানস-সাগর হতে ফিরিবে কি কলহংস দল ?
দারুচিনি বনে আজ নামিয়াছে তুষারের ঢল
আমার তাসের ঘর লুটাইছে পথের ধূলায়।
আমি কি হেনেছি কভু কোনদিন বিষের সায়ক।
তুমি কি দেখেছ কভু বজ্রাহত মূক বনস্পতি !
শুনেছো কি কোনদিন তটিনীর কুলভাঙা গান—
আমার শৈলচূড়া চূর্ণ হল তব পদতলে।
এসেছে সিন্ধবাদ—উড়ে আসে শ্মশান-শকুন
জাহাজ দুলিছে বাঁয়ে—ছেঁড়াপালে ঝড়ের মাতন।
গরজে লক্ষ ঊর্মি—প্রলয়ের বাজিছে বিষান
মহাকাল গ্রাসিয়াছে জীবনের সুন্দরে আমার।
দুর্বার অশ্বের গতি—রথচক্র চলে অবিরাম
দুরন্ত কামনা-নাগ ক্ষুব্ধ রোষে ফুঁসিতেছে আজ।
ধূমকেতু পুচ্ছে জ্বলে সপ্তর্ষির পাবক দাহন
দক্ষিণ-দিগন্তে মোর রঙধনু আজও দেখা যায়।

তোমারই জীবন এই ● মণীন্দ্র রায়

ক্ষমা? কাকে ক্ষমা করি? ঘৃণা, তাও নয়।
আমি কি মহৎ, গুরু? শুধু দূর থেকে
হেসে হেসে জানাব আশিস্?
তুমি-যে সমুদ্র, আমি একাধারে দেবতা-অসুর;
সময়ের আমন্থিত তৃষ্ণা পার হলে
আমারই তো সুধা আর বিষ!
না, আমি কাঁদি না আজও অনুতাপে; বলি না তোমার
আকাশে যেহেতু ঝড়, বজ্রের ভ্রূকুটি, বারে বারে
যাব না সে বিহঙ্গের নীলে।
যে ঈশ্বর জন্ম দিল আলোতে, সে বিধি
রক্তের তরঙ্গে বুকে লিখেছে, আমার মুক্তি শুধু
অয়শ্চক্র তোমারই নিখিলে।

অথচ আমি--যে বন্দী, তাও নয়; এ বৃক্ষ হৃদয়
অনন্য নির্ভর—বাঁচে তোমারই মাটিতে মেলে তার
শিকড়ের শত বাহুলতা।
তোমারই জীবন এই পত্র পুষ্পে; আমি আছি, তাই
তুমিও রয়েছ নিত্য—হে সাবিত্রী, আমার আকাশে
নও তুমি ভ্রান্তি বা কুলটা॥

বৃষ্টি আর আমি ● জগন্নাথ চক্রবর্তী

দুটি প্রাণ কাঁদে শুধু অন্ধকার শ্রাবণের রাতে
দু'জনেই দৃষ্টিহীন—
বৃষ্টি আর আমি।
শ্রাবণের অন্ধকারে
নির্বাপিত প্রদীপের অঙ্গারের ঘ্রাণ
সমস্ত আকাশটাকে গন্ধে ভরে—
রাত্রিনীল স্মৃতির সৌরভ।
বৃষ্টির আকাশ থেকে উড়ে আসে ভয়ার্ত্ত ফড়িং
কান্নায় সমস্ত ডানা ভিজে—
কার কান্না? তার নয়।

পৃথিবীর এই এক রীতি
কান্না তা সে যারই হোক
তোমাকেও নিশ্চয় ভেজাবে,
তোমারও আকাশটা নেভাবে সে।
এই জল শিলালিপি পাহাড়ের গায়ে
যুগ থেকে যুগান্তরে ব্যথায় ক্ষোদিত,
হায়রে হৃদয়হীন ক্ষয়হীন শিলা।
জলস্রোতে ভেসে যায় কালস্রোত
ডুবে যায় আকাশের ডানা,
বুকের বালুকাতীরে আর্ত্তস্বর

সে শুধু ডোবে না।
তাকে আমি বারে বারে ঢেকে দিই
কী দিয়ে যে ঢাকি!
চোখের গভীরে যার জন্ম হল
চোখের আড়ালে তারে রাখি।
লবণাক্ত পৃথিবীর মাটি
জলে ও প্লাবনে,
সেই মাটি ফুঁড়ে ওঠে লতার শরীর
সেই মাটি আমার জননী;
তাই আমি শ্রাবণ রাত্রিতে
বিরহিনী।

আরো এক কান্না আছে যা আমার সর্ব্বাঙ্গে অস্থির
আমার সমস্ত সুধা, সব সুখ,
বসন্তের সমস্ত মিনতি,
যে কান্নায় অন্ধ আমি
যা আমার ব্যথার আরতি।
আমার কান্নার প্রতিধ্বনি
আমাকেই আবার কাঁদায়,
যতোবার তার ছিঁড়ি বাজে ততবার
নিভৃত ঝঙ্কার!

আমার কান্নার জলে যদি কেউ ভেজে
এই ব্যথা যদি কেউ ছোঁয়
সে শুধু আমাকে নয় সমস্ত ব্যথাকে পাবে,

সে শুধু আমাকে নয় পৃথিবীর সমস্ত কান্নাকে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে।
কারণ, পৃথিবী খুঁজে পাবে না তৃতীয় ;
দুটি প্রাণ কাঁদে শুধু অন্ধকার শ্রাবণের রাতে
দু'জনেই দৃষ্টিহীন—
বৃষ্টি আর আমি।

তারার তিমিরে ● নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অনায়াসে কেউ কেউ আলোর শরীরে
যেতে পারে। যায়।

অনায়াসে কেউ-কেউ আশ্বিন অম্লান আভায়
মগ্ন হতে পারে। তারা যদি
অষ্টবসু হত, তবে যেত ফের স্বর্গরাজ্যে ফিরে
অক্লেশে। কেননা তারা লোভ, রক্ত, ঘৃণা,
হিংসার উপরে উঠে হতে পারে রোদ্দুরের নদী।
এখানে উল্লেখযোগ্য, আমি তা পারি না।

বস্তুতঃ যেহেতু আমি দেবব্রত নই, সুতরাং
দীর্ঘকাল আমি এই অন্ধকারে আছি।
মনুষ্য-প্রতিম, কিন্তু বিকলাঙ্গ, অগণন মুণ্ডহীন মাছি
যেখানে রক্তের স্রোতে ডুবেছে নীরবে।

মনে হয়, ভুলে গিয়ে ফুল, পাখী, পরিচিত বন্ধুদের নাম
আরো কিছুকাল এই অন্ধকারে থেকে যেতে হবে।

নায়ক ● গোবিন্দ চক্রবর্তী

তুমি আমি চিনি বা না চিনি
সেও সওদা করে এই হাটে—
হয়ত বা গায়-গায় ছোঁয়াছুয়ি হাঁটে :
পাশাপাশি করে বিকিকিনি।
একই পথে আসা যাওয়া
একই খেয়া করে পারাপার—
সবার সমান অংশীদার
সুখের দুঃখের :
হাসে, কাঁদে গল্প করে আর
তোমার আমারই মত
গ্লানি ভরা ব্যর্থ জীবনের ;
জীবনের গ্লানি আর ব্যর্থতার মানে
যেমন সবাই জানে,
সেও মানে
ললাটের নক্ষত্রের দোষ
তিক্ত অন্নে, অর্দ্ধাসনে—
তারও তাই তৃপ্ত হতে হয়,
পেতে হয় অতৃপ্ত সন্তোষ।
নামহীন, গোত্রহীন, পরিচয়হীন
সে এক একান্ত অর্বাচীন

ম্লান মুখ আর ম্লান চোখ,
কল্পিত পুণ্যের লোভে
পাণ্ডারে সেলাম দেয়—
দুর্বৃত্তেরে ঘুষ দিয়ে
আরো ঋণে ডোবে,
অপরাধ হোক বা না হোক।
তবু জানি মহাকাব্যে—সেই হয় একদা নায়ক
সেদিনই যায় না চেনা
আর বুঝি তাকে—
ইতিহাস রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধ হয়ে থাকে,
ভীতত্রস্তা বসুন্ধরা কাঁপে ঃ
ঝলসায় নিষ্কাশিত তীক্ষ্ণ তলোয়ার
অকস্মাৎ যুগান্তর রং ধরা খাপে,
বাস্তিল বিচূর্ণ হয় তারই যাত্রাপথে
আঠার-শ' সাতাশয়।
অকস্মাৎ সেই উঠে দাঁড়ায় ভারতে,
জারের মস্কোয় ছোটে বিদ্রোহী মিছিল,
সরে যায় গর্বোদ্ধত চীনের পাঁচিল,
মিশরের মৌন-মগ্ন পিরামিড পাশে
ক্ষিপ্রবেগে উল্কাসম সেই ধেয়ে আসে।
গোত্রহীন—পরিচয়হীন
কালের পাথরে আঁকে তবু কী যে স্বাক্ষর নবীন
অঙ্কুরিত সে প্রতিজ্ঞা
দিনে দিনে দীর্ণ করে অন্ধকার ব্যূহ

তারপর একদিন হয় মহীরুহ
ফলে ফুলে অপরূপ নয়নাভিরাম।
গ্রীণল্যাণ্ড থেকে ভায়েৎ নাম,

সব দেশই দেশ তার, সব নামই নাম
সে-চির পথিক, পদাতিক ;
তুমি আমি করি আর না করি বিশ্বাস
সূর্য্য তাকে শ্রদ্ধা করে,
তার ইতিহাস
তাকেই নায়ক করে আন্তর্জাতিক।

সম্যাচ্ছন্ন ● সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

শব্দ করে ভাঙো এই দুঃখের প্রাচীন অধিকার ;
যে দুঃখে এখনো আমি আকাশকে নীল রক্তে লিখি
পাখির সহজ ডানা তাকে নিয়ে ভেসে যায় মেঘে অসীম পারাপারে ;
বলি এসো, কাছে এসো অন্তহীন কবিতার দুর্লভ বিরহে।

কাকে লিখি নিশিদিন ! কে আমার ছন্দের শরীর
একান্তে রক্তাক্ত করে উন্মাদ উন্মাদ তীব্র বাসনা বিক্ষোভে।
খুঁজি তারে উন্মোচনে, আপাদ মস্তক খুঁজি স্তনে গ্রীবামূলে।
মনে ঘোরে অন্ধকার আচ্ছন্ন কেশের ভারে রেখার আর্দ্রতা
গৌরীবধূ ভোর তবু নিঃশব্দে দাঁড়ায় এসে উষার অভ্যাসে।

কেন ভুলে আছি আজো অগ্নিময় যথার্থ যজ্ঞের
সাহসী মন্ত্রের ধ্বনি ; কেন আজো তুচ্ছ রচনায়
শিল্পের নিঃসঙ্গ মুখ বারবার ভুল ভেঙ্গে ফেলি ;
কোথায় প্রধান তুমি, হে দক্ষিণ দেবতা আমার,
একবার দৃশ্য হয়ে এই রুদ্ধ রক্তে ফুটে ওঠো।
শুধু আমি নির্নিমেষ সমাপ্তির তীরে বসে দেখি
বুকের অন্তিম পণ্য অস্থির জোয়ারে ভেসে যায় ··
কিছু শব্দ হোক, ভাঙে, প্রাচীন দুঃখের সব বৃদ্ধ অধিকার॥

প্রেম বিহীন ● সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে ডুবে যাব, সুরম্য বিজয়া,
ধৃষ্ট বাঞ্ছা মুছে গেলে পার্থিব ললাটে, ওষ্ঠে, চুলে
রূপালী আগুন থেকে কে বাঁচাবে ? বৃক্ষসম দয়া
সবুজ আঁচলে ঢেকে, জয়া, তুমি এসেছিলে মায়াবী আঙুলে—
বিশ্ব চরাচর ছুঁয়ে দিতে, যেন, বিশ্বাসের গোপন সৌন্দর্য্যে,
প্রতিভায়
বিখ্যাত শান্তিকে পাবে, যেন আমি পৃথিবীর
সবটুকু খনিজ গন্ধক
চুরি করে হেসে উঠব হা-হা শব্দে, অস্ত্রহীন রাত্রির বিভায়
আমাকে সাজাতে বুঝি চেয়েছিলে, দয়াময়ী সভ্যতার শেষ
বিদূষক।

পৃথিবীকে ভালবাসব, এতখানি ভালবাসা এই বুকে নেই
গভীরে প্রতিষ্ঠাবান আয়ুহীন কীর্ত্তির পাতাল ;
মুহূর্তে জীবন শিল্প চূর্ণ হয়, গ্লানিহীন পরমুহূর্ত্তেই
ঝলসে ওঠে স্মৃতিমূর্ত্তি, গ্লানিহীন রূপালী আগুনে চিরকাল।

ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে ডুবে যাব খর চক্ষে, অটুট শরীরে
অভিলাষ গুপ্ত করে কৃষ্ণকায় হীরকের মত,
এক জীবনের শোক বহু রূপান্তর স্রোতে আসে ফিরে ফিরে
জয়ী, তোর প্রেম পেলে উরুদ্বয় শক্তিমান হ'ত।

বক্তব্য ● হরপ্রসাদ মিত্র

কিছু যে বক্তব্য থাকবেই জীবনের প্রতি ঘটনাতে
গ্রাহ্য কোন তত্ত্ব কিংবা দৃশ্য কোন গভীর ইশারা
তা নয় ; তা নয় ; রাস্তা পড়ে আছে সবার হাঁটবার।
কুকুর, মানুষ, গাড়ী—এমন কি বাতাস বা আলো
তারাও আসছে যাচ্ছে, সব নিয়ে দেশ আর কাল
বিস্তার ও পরম্পরা বিস্মিত এ-লক্ষকোটী বোধে।
জীবনের এই জ্ঞানে ভেদ নেই শিক্ষিত নির্বোধে।

রাস্তায় কাঁপছে গাছ, জ্বলছে কোনো নদীর ঢেউয়েরা,
ছায়া পড়েছে ইতস্ততঃ, পাখী উড়ছে, ফুটে ঝরছে ফুল,
প্রেমেতে দুলছে বুক, শোকে ভাঙছে, লোভেতে থর্‌থর—
তারই মধ্যে মনে জেগেছে কী জানি কী বিশ্ব-চরাচর।
স্বরূপ জানবে না কেউ, জানা যে-সব সামান্য জানলায়,
মনের যে-সব সূত্রে, বোধের যে-সব ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
জগৎ ছাড়িয়ে যায় সেই সব বেড়ার বেষ্টন।
সত্ত্বা তো তাতেই বন্দী—মৃত্যু হয়তো শেষ পরিত্রাণ।

ইতিমধ্যে বর্ষা এলে মনে পড়বে কোনো শান্ত মুখ,
ইতিমধ্যে চৈত্র এলে ফুটে উঠবে রাত্রির বকুল।
আকাশে নক্ষত্র জ্বলবে, মা থাকবেন দূরের দুর্লভ ॥
মৃত্যুর ওপারে প্রিয় জ্বলবে সব জীবনবল্লভ।

সমস্ত মমতা থাকবে অন্ধকারে দূরের তারাতে।
কেউ নেভেনা ভালবাসায় মন ভাববে হারাতে হারাতে।

তবু তো একদিন কোনো বাসে, ট্রামে ট্রেণে, বা জাহাজে,
ছায়াচ্ছন্ন হাসপাতালে কিংবা কোন দুর্বার প্রপাতে
নিজেকে ডোবাতে হবে, যাবে এই দুর্মর নিজত্ব।
ঈশ্বরে মিশবে সবই অনুত্ব, বৃহত্ত্ব।
এবং ঈশ্বর তাই চোখ বুজলেই অন্তরে আসেন।
দুর্জ্ঞেয় নাস্তিই তিনি, অস্তিকে নাশেন।

সায়ন্তন ● অরবিন্দ গুহ

নদী দেখো। নদীতে মেঘের ছায়া ফোটাও, ভাসাও।
যাও, তুমি দ্রুত চলে যাও।
মেঘ আনতে পারো না ? তাহলে তুমি নদীর গভীরে
নিজেই উদার ছায়া হয়ে শুয়ে থাকো সশরীরে।

না, আমি নদীতে নিজে থাকিনা। তোমাকে
কিন্তু আমি নদীর আশ্রয়ে থাকতে বলি।
জলের সংসার থেকে যে তোমাকে নিরন্তর ডাকে,
সে আমার ভালবাসা, হৃদয়ের রক্তের কাকলি।

প্রতি রাত্রে চোখে পড়ে নক্ষত্রের সকরুণ ভাষা ;
নদীর হৃদয়ে ক্ষুধা, শরীরে পিপাসা।
ঝিনুক, কয়েকটি নৌকো, ষ্টীমারের বাঁশি, মাছ, বালি ;
চিরকাল দুই তটে শিশুরা বাজায় করতালি।
সমুদ্রে নদীর গতাগতি ;
এবং আমার প্রেম জানে তার নদীতে বসতি।
মেঘ আনতে পারোনা ? তাহলে তুমি নদীর গভীরে
নিজেই উদার ছায়া হয়ে শুয়ে থাকো সশরীরে।

ফাগুনের উচ্চারণ ● সুনীল বসু

জানালায় ইচ্ছা খোলে, প্রকৃতির পুষ্পলতা
আকাশের রাত্রি যেন বালকের রূপকথা।
নক্ষত্রের তির্যক চাহনি
যেন কটাক্ষের কণ্টক বেঁধায় রাত্রির রমণী।
আস্তাবলে রেস্তরাঁয় নির্জনতা হয়ে আসে শব।
ধরিত্রীও হয়ে আসে নীরব নিস্তব্ধ জরদগব।
স্মৃতির বর্ত্তিকা জ্বলে একটি দুটি হৃৎপিণ্ডের
তাজা রক্তে, জ্বলে অতৃপ্ত কামনা,
ক্ষতে যেন নুন,
তুমি ফাল্গুন—
জানোনা কি বিষাক্ত বিচ্ছেদের যন্ত্রণা।

ভাঙেনা কেন পৃথিবী, ভূমিকম্পে বিস্ফোরণে,
অকালবার্দ্ধক্যে কেন প্রেত হয় না প্রেমিক
আমি যদি প্রত্যাখাত পিপাসার রোমন্থনে
তবে রমণীরা কেন না হবে জ্বলন্ত বিষাক্ত বৃশ্চিক,
নিজেকেই ভাবি আমি নিজের দেহের কশাই—
না হয় পুড়িয়ে করি ছাই
চিকুর চিবুক করোটি মাংস হাড়
হই প্রতিচ্ছায়া কবন্ধের বীভৎস।

আয় রাক্ষসি, চেড়িবৃন্দ, নৃত্য কর,
প্রলয়ের ডঙ্কা বাজা, চিতায় সাজা অলীক খেলাঘর
হে বায়ুস্রোত বাজাও দামামা
গলে যাক লক্ষ তাপে গালা মোম লোহা তামা
সমস্ত শর্বরী হোক চিতার শ্মশান
ডাকিণীরা চাপাক কটাহ, হোক ভাসমান
ফুটন্ত রক্তে পশু আর মানুষের মাংস হাড়—
হোক অন্ধকার
নিষ্ফল লম্পট ধিকৃত সংসার।

সমস্ত রাত যন্ত্রণায় দাউ দাউ জ্বলে
মানবীর ধর্ষিত অসতী দেহ ভেসে ওঠে
উন্মাদ অশ্ব ডেকে ওঠে আস্তাবলে
দেয়ালে দেয়ালে ফোটে
মৃত্যুর সংকেত।
জানালায় রাত্রি ঝোলে, আমার শয্যার চতুস্পার্শে
ঘিরে বসে মৃত পূর্বপুরুষ প্রেতিনী ও প্রেত ॥

জীবন, তোমার কাছে ● সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

১

জীবন, তোমার কাছে আমাদের দাবি
এই শুধু আছে যেন সময়ের চাবি
অন্য কারো হাতে চলে গিয়ে
দেয় তবু চিরন্তন অন্তর মিশিয়ে
আমার তোমার আর সবাকার চির ভালবাসা
রেখে যাওয়া, যেন সর্ব্বনাশা :
কোথাও অসার কোনো মেঘের কিনারে,
কোথাও আষাঢ় এনে যেন বারে বারে
নিয়ে তার শস্যের নিঃশ্বাস
ভরিয়ে দেয় তা দিয়ে স্বাস্থ্যের পরম
উত্তাপ আরাম আর দেহ মনোরম
দেশের অপূর্ব্ব মৃদু স্বপ্নিল আরাবী।

২

দূরাগত ঘ্রাণ আমাদের
মাতালের মতো আনে অভিমান যতো
কোন মানে নেই শত শত
প্রার্থনায় ঢেলে দিতে আকুতির জের
দিন অবসানে
কবে কোন দিনান্তের দানে

এসেছিল তোমার আমার
একান্ত মঙ্গলময় জীবন বিথার
তার আজ সংকুচিত পরাজয় গীতা
শুনি যেন গায় কোন প্রীতা।
গেয়ে চলে মনের দুকূলে
যেন সব অশান্তিকে ভুলে।

৩

যেন কাল সৌন্দর্য্যের মহৎ কল্পনা
আত্মার সুরভি,
আমাদের পরম পূরবী
ছিল কোন উজ্জ্বলতা নিয়ে
অমৃতের কতো মৃদু মন্ত্র দিয়ে দিয়ে
আমাকে সম্বিত দেয় কিন্তু তার আদি
জানা নেই জীবনের বিস্মিত সত্তার
বারবার
আসে আর যায়
বিস্মৃতির প্রায়।
আজ তুমি কোথায় বলো না
কোথায় তোমার পত্রখানি
কোথায় সে জীবনের মন্ত্রগাথা বাণী
আসে এই দিকে
আসে জীবনের মন্ত্র দিয়ে যেতে যেন
কোনো দিন শুনবে সে কেন
ছিল এইখানে।

ডিভাইন কমেডি পড়ে দান্তেকে ● নচিকেতা ভরদ্বাজ

যৌবনোদ্ধ তনু তার ; একটি নিটোল হাতে নির্বিষাক্ত ধূল
হয়তো সে ফুল হয়ে উঠবে বা উঠেছে কখনো
আমরা কি জানব তাকে, জানতে পেরেছি তার কোনো
ইতিহাস ? জীবন কি যৌবনের ভুল
কখনো জেনেছে !—হায় দান্তে, তুমি দশম স্বর্গের
কল্পনায় ক্লান্ত হয়ে বিয়াত্রিচকে ব্যাথার সোপানে
সমর্পিত করে গেছ। জীবনের মগ্ন অন্ধকার
তুমি কি, তোমাকে এসে কোনোদিন কান্নার অতল জলের
কোন শব্দ শোনায়নি।—বুক অব সামসের গানে
তাহ'লে কি সব কিছু শান্ত হতে পারে ? এক নির্লিপ্ত প্রসার
হয়তো জীবনবোধে উদ্দীপ্ত এ সমুদ্রকে করেছে শাসন
হয়তো লবণ জলে মাঝে মাঝে মুক্তোর জন্ম হতে পারে,
হয়তো শঙ্খের বুকে শোনা যাবে স্বপ্ন, শব্দ ; শুক্তির হৃদয়ে
হয়তো থাকবে আঁকা বর্ণালির চিত্রিত চরণ।

তবু তা কি সত্য ? বিয়াত্রিচকে নিয়ে যে ব্যাথা
জীবনের সমুদ্রের দুরন্ত এপারে
উদ্দীপিত হয়ে ওঠে ; অনেক ওপার থেকে বলো তা নির্ভয়ে
হে কবি মহৎ শিল্পী ! তুমি কি অজস্র শান্তি
পেতে পার, পেয়েছ কি ; প্রেমে ও অপ্রেমে
কোনোদিন শোনোনি কি হৃদয়ের রক্তের নাচন ?

ভোরের নির্জন সেতু—জানে সে অস্পষ্ট ইতিহাস,
আবেগের অস্তসূর্য্য—কোনো ক্লান্ত কুয়াশায়
শিশিরে হাওয়ার হাতে গিয়েছে কি থেমে ?
আমরা কখনো এক স্বর্গীয় স্বপ্নের অধিকারী
দেবদূতের সহচর হতে পারি, হৃদয়ের অন্তর্লীন
সমস্ত স্বপ্নের নিহিত বিকাশ
আমাদের অপার্থিব করে দিতে পারে। তবু আমরা কি জেনেছি
আমরা যারা তীক্ষ্ণ সূর্য্যে—আলো ছুঁয়ে—জল মেখে—
ধূলো—ঘেঁটে—প্রত্যহের পূর্ণ পথচারী
মাটির মুহূর্ত্ত শিশু।—আমরা কি আমাদের সন্নিহিত মুখ
জলের আয়নায় দেখে এইসব মুহূর্ত্তকে ধ্যানে পেতে পারি ?
পেলেও প্রবাসে প্রশ্নে আরো নানা অন্ধকারে যখন হেঁটেছি
দেখেছি হারিয়ে গেছে সেইসব সত্য স্বপ্ন, শক্তির উচ্চার
অভাব আশঙ্কা ভয়—জন্ম আর জীবতায় ; জীবনই যে জন্মের
অসুখ।

পলাতক ● আনন্দ বাগচী

মধ্যদিনে দেখা দিলে তুমি।
যখন প্রগাঢ় রুক্ষ লাল মাঠে আমি একা বিষণ্ণ পথিক
জীবনকে মুঠো ভরে পেতে গিয়ে
হারিয়েছি কখন ধূলোয়,
গান বন্ধ হয়ে গেছে, নিরাত্মীয় চতুর্দ্দিক জুড়ে।
নাটকের সাঁকো বেয়ে দেখা দিলে তুমি।

মধ্য দৃশ্যে সমাহৃতা কোনো এক প্রক্ষিপ্ত নায়িকা
অধরে তাম্বুল রাগ, মুখে লোধ্ররেণু, বাম হাতে
কোন লীলাপদ্মের কোরক
ছিল না একথা মনে আছে।

অভিনয় পর্ব্ব শেষ হলে,
ক্লান্ত পায়ে বাড়ি যাব অন্ধকারে রাত্রির বিবরে।
আমার চারপাশে শুধু স্মৃতি, শুধু স্মৃতি ;
শুধু মৃত কথা আর অসহ্য জোনাকি
মৃত নক্ষত্রের মত।
নিজের পায়ের শব্দ শুনে স্বপ্নালোকে চলে যাব।
অভিনয় পর্ব্ব শেষ হলে,
ঈর্ষার, ঈপ্সার পট ক্ষেপে
আমি ক্লান্ত প্রাণ সব প্রেম-প্রীতি-অশ্রুজল মুছে
ইতিহাস হয়ে যাব কবে।

বধ্যমঞ্চ দূরে ছিল, আলো-জ্বলা সাজঘরে বসে
চিত্রিত রেখায় বন্দী এই আত্ম মুখশ্রীকে দেখি
অপরাহ্ণ হয়ে যেন নিভৃত দর্পণ জুড়ে জ্বলে ;
আঁকাবাঁকা পথ চতুর্দিক থেকে মাকড়সার মত
মঞ্চজাল রচনা করেছে,
আমি ওইখানে যাব সর্ব্বাঙ্গের বিবিধ মুদ্রায়
কখনো ফোটাব ফুল
আলোক অমৃত কখনো-বা
বিষবৃক্ষে রুচিকর ফল ।
প্রতি নায়কের মত সমস্ত বিষণ্ণ সন্ধি খেলে
আমাকে নিবিড় বৃত্তে ঘিরে,
যন্ত্রণারা সঙ্গীতের মত ।
এমন সময় তুমি এলে সাঁকো বেয়ে
অধরে তাম্বুল রাগ, মুখে লোরেধ্রেণু, বাম হাতে
কোন লীলাপদ্মের কোরক
ছিল না একথা মনে থাকবে চিরকাল ।
বধ্যমঞ্চ পড়ে রইল নির্ধারিত জীবন-সঙ্গিনী
সঞ্চিত সংলাপ আর
সর্ব্বাঙ্গের মুদ্রা বহুবিধ ।

যে আমার দক্ষিণ শিয়রে ● রাম বসু

তাকে বলি অন্যমুখ। সে আমার দক্ষিণ শিয়রে
অবিশ্রাম কল্লোলিত, শিকড়ের আকর্ষণে স্থির
রাজেশ্বরী। বোধ ব্যাপ্তি প্রশ্নহীন স্তব্ধের উপরে
অনন্ত—পূর্ণিমা, শান্ত ; নীলিমায় পুষ্পিত, গভীর।

যে দিকে পড়েনি আলো সেই দিকে বিতর্ক কল্পনা
উর্নজাল জটিলতা, বাণী রাখা দৈবের পাশায়
বৃক্ষের মর্মর থেকে উৎসারিত অম্লান ঘোষণা
সর্ব্বাঙ্গে বেজেছে যার মুকুলিত হিমগ্ন আভায়
সে এখন প্রতিধ্বনি সমগ্রের স্বচ্ছ দৃশ্যপটে।
প্রবল প্রপাত দূরে পাল তোলা নৌকার কাতার
মাস্তুলের মুগ্ধ পাখী তরঙ্গের উত্তাল নিকটে
ভেসে গিয়ে অন্তরালবর্ত্তী কুঞ্জ মাতায় আবার।

অদৃশ্য দৃশ্যের মধ্যে, সঞ্চারিত আকাংখা শরীরে
অপর্য্যাপ্ত টুকরো ছায়া গেঁথে গেঁথে আমি চিরকাল
উদ্ভাসিত স্বর, সত্তা ; সময়ের কণ্টকিত তীরে
বিনীত গোলাপ, স্নাত ; মৃত্যুচিহ্নে উদ্দীপ্ত কপাল।
করোটীর উপত্যকা উন্মীলিত, নিম্নভূমি নীল

হে প্রেম আমার হোক চারিদিকে শুভ্র আবির্ভাব
যেন সব বৈপরীত্য ডুবে যায় ; বিরুদ্ধ নিখিল
নিজের আলোয় বেঁচে ফিরে পায় সঙ্গতি স্বভাব।

আকাংখার ঝড় ● অমিতাভ দাশগুপ্ত

তোমার দুচোখে ওই সাগরের দু'ঝিনুক নীল
আমার এ কবিতায় বয়ে আনে অনবদ্য মিল
এ প্রশান্তি ছিল ততদিন
যতদিন বিশ্বাসের কৃতঘ্ন পাথরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
একান্তেই হইনি বিলীন।

একটি তারার এক মুহূর্ত্তের এক ফোঁটা ভুলে
সমুদ্র-স্তনিত উপকূলে
শুক্তির আঁধার ঘরে বালিকণা—জল
স্বাতীর সংগম শেষে প্রবৃদ্ধ জরায়ু কোষে মুক্তার আনন্দ
টলমল
তেমনি তেমনি ছিল কবিতার মন নিয়ে কবির কাহিনী।

সৃষ্টি ক্ষমা, পারঙ্গমা
অক্ষমতা করেনি সে ক্ষমা
গড়ুরের মত তার তৃপ্তিহীন অমৃত পিপাসা
সময়ের দ্যূতক্রীড়া খেলে হেরে
তবু কিছু শব্দের মোহও ভালবাসা।
অভীপ্সায় জ্বলে গেছি। মেধাবী মনের ঢেলে রস
উচ্চাকাঙ্খা বিত্ত আর যশ
নালন্দার কক্ষ থেকে মোহানজদারো বা হরপ্পায়

চোখের সবুজে মুছে যারা চলে যায় তাদের মতন
যদি ঝরে যায় মন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য শিল্প শেষ করে
ধূলোট হাওয়ায়
এই ভয়ে
সব অবক্ষয়ে
সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখি সময়ের উইপোকা থেকে।

নিটোল আঁধার চারিদিক হতে দুহাত বাড়ায়
প্রিয় নামে ডাকে, বলে ঃ শুধু শুধু কেন মিছে এই
আলো প্রদীপন, ওতো নিভে যাবে দমকা হাওয়ায়
যেহেতু ফুটেছে ঝরবেই জানি সময়ের যূঁই
এহেন দর্শন শুনে
আমার মতন যারা সময়ের গরাদেতে ক্ষতচিহ্ন
করে দিতে চায়
তারা মৃত্যুত্তীর্ণ নয়।
তবু কত নির্জন হৃদয়,
হতে চায়না তো অবসান
গান হয়ে সুরু হয়ে ভেসে যেতে চায় তারা
পৃথিবীর বুক থেকে নক্ষত্রের কান।
বিস্মৃতির রং-ছুট মুহূর্তেরা জড় হয়ে বলে
এতদিনে এ বিশ্বাস হল-তো তাহলে
মূর্খের মতন তবে মিছে কেন আর ঘুরে মরা
সময় হয়েছে চল, মৃতের বন্দরে যাক ফেরা
মিছে অনুলীন হয়ে থাকা
অসম্ভব অমরত্ব অসম্ভব মহাকবি হবার প্রত্যাশা।

আমি শুধু বললেম : জানি আমি মৃত্যুত্তীর্ণ নয়
তবু জানি, আশ্বিনের কিশোরী নীলের যে বিস্ময়ে
মেঘের আড়ালে আছে, তাকে আনে আকাংখার ঝড়
বিনিঃশেষে উড়ে যায় জীবনের কুটো আর খড়।
মহাকাল স্রোতোমান ; তবু আজো সৃষ্টির প্রণাম
সস্নেহে সে তুলে নেয়। বুকে লিখে রাখে তার নাম।

কয়েক জন ● মানস রায়চৌধুরী

॥ যুক্তিবাদ ॥

ফুটন্ত চায়েও আছে প্রাণঘাতী জীবাণুর বাসা,
আমার জনৈক বন্ধু এই ভয়ে প্রতিদিন চায়ের 'পিপাসা,
অতৃপ্ত রাখেন কাফে রেস্তোঁরায়, কিন্তু উনি এ্যাল কোহলে
আস্থা রেখেছেন।

সর্ব্বরোগহর এই সাধ্বীরস—এমনি কি ভাঙা হ্যারিকেন
জ্বেলে রাখা শহরতরী কোনও নষ্ট বিপনীতে
সানন্দে যাবেন তিনি, রসায়ন গ্রন্থে নাকি স্পষ্ট লেখা আছে
সুরা ব্যাসিলির যম—তাইতো সহজে নোংরা
গেলাসের কাঁচে
রাখেন নিশ্চিন্তে ঠোঁট। শূন্যবাদী বন্ধুবর, চেয়েছেন
শূন্যের গভীর স্বাদ নিতে।
যেহেতু চুম্বনে সংক্রামিত হয় বহু ব্যাধি, নিদেন পক্ষে
সে দস্ত রোগ

তাই শতহস্ত দূরে রাখলে নায়িকার বাহুর সম্ভোগ।
জীবাণু ছাড়াও লক্ষ মৃত্যু আছে, সংখ্যাহীন রোগশয্যা
এই পৃথিবীতে
এ তথ্য বোঝার ঢের আগে তার আত্মতৃপ্ত হাসি
মিলায় যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখচন্দ্রে : কালান্তক এইখানে ;
ডাক্তার, বুঝলেন যকৃতে
হায়রে আকাঙ্খা ছিল, রোগবীজহীন দেহে হবো আমি
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী।

॥ বায়ুসেবী ॥

বাড়ীর সামনেই রোজ দেখা হত সেই মুখ,
তাম্বুল রঞ্জিত দন্তরুচি
চারমিনারের ধোঁয়া : কী মশাই বেড়াতে চল্লেন ?
বেশ বেশ। সকাল বিকাল যদি ভ্রমণের অভ্যাস রাখেন
তাহলে দেখবেন রোগ টোগ নেই, এই স্বাস্থ্য
বলতে বলতে ছিটকে আসে সুপুরির কুঁচি।
আমি কিন্তু কোনদিন বেড়াতে দেখিনি তাকে,
বলে রাখা ভাল
বায়ু সেবনের ইচ্ছা সম্ভবত তিনি মেটাচ্ছেন ওই ভীষণ
জোরালো
তামাকের ধোঁয়াতেই। একই কথা, সামান্য প্রভেদ
ছিল বলে
একদিন যেতে হলো রঞ্জন রশ্মির নীচে, কর্কট দংশনে
যায় বুক গলা জ্বলে।

॥ লাভারস্ ॥

সিনেমার অন্ধকারে ওরা চেনে নিজেদের, স্পর্শাতুর হাত
যেটুকু আনন্দ নেবে তাই ঢের, ওদের বরাত
অসম্ভব ভাল বলে যারা হিংসে করে, আমি তাদের
জিজ্ঞেস করে জানি
হাবা বোবা যাই হোক, যদি কাউকে মিলে যায় করবো
তাকে রাণী
ভালবাসতে খুব ইচ্ছা করে, আর ওই সব লাভারস্‌কে দেখে
এমন কমপ্লেক্স হয়, বুঝেছেন, ইচ্ছে করে সায়ানেড
দেখি জিভে চেখে।
নায়ক নায়িকাকে যদি এই কথা বলি কানে কানে,
তারা খুব জোরে হাসবে, তারপর দার্শনিক সেজে
গম্ভীর গলায় বলবে—দেখুন কিছুই নেই, অনিত্য
সম্পর্ক এইখানে
সবই সেই বহুশ্রুত দিল্লীকা—লাড্ডুর গল্প, কে যে
তৃপ্ত হয়েছিল কবে, কোনদিন ভালবাসা পেয়ে
ঈশ্বরও জানেন না সেটা, সমস্তই সংসারধর্মের মুখ চেয়ে।
তাই যদি হয় তবে বিবাহে বিলম্ব কেন, কেন বাছাবাছি?
অন্ধকারে দীর্ঘ ওড়ে একজোড়া আহার বিরত অন্ধমাছি।

সাজানো বাগান ● দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিলার আড়ালে জানি তোমার ওই সাজানো বাগানে
এখন আর কেউ নেই একটিও কুসুম কোনখানে
স্মৃতিচিহ্ন নেই, শুধু হাওয়ায় ধূলির ঘূর্ণি ওড়ে
শুধু রুক্ষ মাটি শুধু শুকনো ডালপালা ঃ
আর হা-হা করে শূন্য চতুর্দ্দিকে দুঃসহ নিরালা।

তুমি আজ দীপ্ত জানি জ্যামিতিক শহরে শহরে।
যদি অগোচরে মন পোড়ে,
কেন সেই দুর্বলতা সকলের অলক্ষ্যে-না রেখে
তুমি ফিরে এলে তুমি কান্নার আবেগে
কেঁপে উঠলে! তোমার ওই শব্দের প্রাচীর বহুদিন
জীর্ণ হয়ে গেছে, আর সঙ্গিনী তোমার
সে আরও কৌতুকে আজ অন্ধকারে মিশে অন্ধকার।
তোমার বাগানে আজ ওড়ে শুধু বুভুক্ষু ফড়িং।

কোন্ পথ ● গোপাল ভৌমিক

অনাদি কালের থেকে
মরণের খড়্গটা মাথার ওপর ঝুলিয়ে
প্রেম করি, ঘর বাঁধি,
সন্তান-সন্ততির জনকও হই
তবু তাড়া-খাওয়া ইঁদুরের মত
দুশ্চিন্তায় বিদ্ধ হইনা,
আগামী কালের কথা ভেবে
থামে না প্রাণের সহজ প্রবাহ।

আজ পৃথিবীর পরিধি যত বেড়েছে
আমার গণ্ডী হয়েছে তত ছোট,
কত দূরে কার হাতে পারমাণবিক বোমা
তা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই :
কোথায় লুকোব শহরে না গ্রামে ?
সবার পথটা ডাইনে না বামে ?

একটা অস্বাভাবিক মরণের সমারোহে
আমার বর্ত্তমান ভবিষ্যত বিপর্য্যস্ত।
বিপন্ন স্থায়িত্বকে তবু উজ্জ্বল করে তুলতে
উদয়াস্ত পরিশ্রম করি,
রাষ্ট্রীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে
পরিবার - পরিকল্পনা পর্য্যন্ত রূপায়িত করি।

অপ্রকৃত সব কিছু জেনে শুনে
পণ্ড-শ্রমে আনন্দের সমাধি ঘটাই।

দাম্পত্য ● সুশীল রায়

চঞ্চল চড়ুই ঘরে সারাদিন অফুরন্ত ওড়ে
একটার গলা কালো, অন্যটার চিত্রিত ধূসরে।
ওড়ার বিরাম নেই, নেই ক্লান্তি যেন ও ডানায়
পৃথিবীর অধিবাসী যেন শুধু ওরা দু'জনায়—
ওড়ার ধরণ আর আচরণ দেখে মনে হয়।
পাখায় রেখেছে বেঁধে পৃথিবীর সমস্ত সময়।
চঞ্চল চড়ুই ঘরে সারাদিন অফুরন্ত ওড়ে
একটার গলা কালো অন্যটার চিত্রিত ধূসরে।
ধূসর কালোর সঙ্গে কথা বলে বিচিত্র ভাষায়,
অকস্মাৎ চলে যায় ঘুলঘুলিতে—ওদের বাসায়।

মঞ্জুলা বলল, "শোনো ওরা বেশ নিশ্চিন্ত দম্পতি
কেমন আনন্দে আছে।"
বললাম, "হয়তো সম্প্রতি হয়েছে বিবাহ।"
শুনে হাসলোনা, মুখ করে ভার
বলল, "বুঝেছি মনে কী যে হয়েছে তোমার।"
চঞ্চল চড়ুই ওড়ে, ক্লান্তি নেই, ক্লান্তি নেই ওড়ে অবিশ্রাম,
কে জানে পাখায় মেখে রেখেছে কিসের পরিণাম।
অকস্মাৎ একী হলো? ঠোঁটে ঠোঁটে কেন ঠোকাঠুকি?

মঞ্জুলা অনড়, তার কানের কিনার দিয়ে উঁকি—
দিই, বলি, "ছিল ভাব, হায় হায়, চটেছে প্রণয়।"
মঞ্জুলা তাকাল ফিরে, চোখে ওটা ভয় না বিস্ময়?
স্টেজের স্বগত উক্তি যেমন, তেমনি গলা ছেড়ে
বলে উঠি—যেন কেউ শুনছেনা—বলি মাথা নেড়ে
"দরকার মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি—স্ফুলিঙ্গ, আগুন।'
মঞ্জুলা তাকায় তেতে, অকস্মাৎ হেসে হলো খুন।

অতৃপ্ত আকাংখাগুলো ● কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সকালে প্রথম রৌদ্রে প্রতিশ্রুত সম্মোহিত শোভা।
মাঠে পথে বনতলে স্তব্ধ হ্রদে পাহাড় চূড়ায়
রৌদ্রের স্পন্দন যেন আকাঙ্খার নৃত্য শীলতায়
বুকের গভীরে আঁকে রম্যতায় তৃপ্ততার আভা।
তারপর রৌদ্র আরো গাঢ় হলে অদ্ভুত প্রতিভা
সমস্ত সংসারময় কাজ করে; দুহাতে কুড়ায়
বিকীর্ণ প্রস্তর, নুড়ি, মাঝে মাঝে যদিও জুড়ায়
দুই চোখ নৈসর্গিক দৃশ্যরম্যতায়. তার বিভা
মুহূর্তে হারায় ফের। পণ্ডশ্রমে, উদ্যোগলীলার
দিনান্তের দীপ্তি শেষ অন্ধকার গাঢ়তর হলে
গুমোট কান্নার বেগ অরণ্যানি শিখরে মিলায়,
রেখে যায় দীর্ঘশ্বাস অন্ধকার পাহাড়ের কোলে।
অতৃপ্ত আকাঙ্খাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো জোনাকির মতো
জ্বলে যায় নেভে আর নিদারুণ আর্তিতে স্পন্দিত॥

প্রবাসী কিশোর এক ● অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রবাসী কিশোর এক আমার বিছানা ভ'রে
ঘুম যায় ;
আমি পাশে বসে আছি ও আমায় একবারো
দেখছে না ।
আমি আঁচলের আড়ে কান্না, ক্ষমা, কোজাগরী
শরীরিণী ;
আর সে বিদেহসত্তা, শুধু বার্তাবহ, তাই
লিপ্ত নয় ।

ভাবি, চোখে চক্ষু রাখি জানুতে বিছাই হাত
আনি মুখ,
দেহ রাখি ওর মধ্যে, শিলাতলে পুষ্পলতা ;
ও যে একা !
আমার তো গৃহ আছে অঙ্গনে, কাজললতা,
ভালোবাসা ;
প্রবাসী কিশোর এক আমার বিছানা ভ'রে
ঘুম যায় ॥

জীবন বেদ ● বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিভৃত মাদুর মেলে যখন ভাবতে বসি—
জীবনের কটা পাতা কালের ধুলোয় ভরে যায়।
মনে আসে যায় কতো সোনার সকাল
উজ্জ্বল দুপুর, কত বিকেলের লাল,
তাদের তাড়িয়ে নিয়ে কালের রাখাল
হয়ে গেছে অতীতের ভূত।
জীবনের রঙ্গমঞ্চে বেদনার বিদূষক
করে গেলো কতবার মর্মান্ত কৌতুক।
অতীতের ভূত হয়ে এ-প্রাণের শূণ্য কক্ষে
ফেলে গেছে তারা কত উত্তপ্ত নিশ্বাস।
তারি তাপে ঝলসালো
জীবনের ফাল্গুনের আশ্বিনের মাস।

শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের কত লঘু দিন।
সুন্দর সুরেলা আর রঙিন, রঙিন—
হারায় মর্মর ; হয় বিবর্ণ ম্লান
সব স্মৃতিচিত্র ; হয় অবসিত চিরভ্যস্ত গান
অনাগত ভবিষ্যেও তাদের নিষ্ঠুর হাত
কতোবার করে গেছে ক্রূর ছায়াপাত
একথা যখনই ভাবি অপচিত জীবনের
কটা পাতা আরো যেন কালের ধুলোয় ভরে যায়

এই তো জীবন-বেদ
কালের ধুলোর ক্লেদ
মিশে থাকে মেদে, মজ্জায়

এই কৃষ্ণচূড়া এবং পলাশ ● রাজলক্ষ্মী দেবী

এবং পলাশ কবে হৃদয়কে সেধেছিল সুরা,
মনে নেই। মন্ত্র দিলো বৈরাগিণী এই কৃষ্ণচূড়া,
বসন্তে সন্ন্যাসী হবে যৌবনের প্রগল্‌ভ মাতাল,
কাষায়ে, গৈরিকে বুঝি ছেয়ে দেবে পলাশের ডাল,
সংকল্প জ্বলবে শুধু অতন্দ্র আগুন প্রতীক্ষায়,
পলাশ অসহ্য রং সামলাবে সানন্দ দীক্ষায়।

এবং পলাশ কবে হৃদয়কে করে কৌতূহলী,
বলেছিলো, - চলো খেলি মুঠো মুঠো কৌতুকের হোল,
মনে পড়ে। কৃষ্ণচূড়া একান্তে শিখছে অনুরাগ,
হোলি ভাঙবে না আর,—আকাশ রাঙবে না ব্যর্থ ফাগ।
পলাশ আবীর আনে—সিঁদূরে সেজেছে কৃষ্ণচূড়া।
বসন্ত চিন্তিত ঃ নেবে একতারা,—না কি তানপূরা ?

সূর্য্যস্নান ● ফণিভূষণ আচার্য্য

বাঁধানো উঠোনে রোজ ধান শুকোয় শীতের দুপুরে
স্বাস্থ্যবতী মেয়ে এক। কণ্ঠলগ্ন সূর্য্যের আশ্লেষে
ধান শুকোয় একাকিনী গান গেয়ে গুনগুন সুরে
উচ্ছৃঙ্খল চুলগুলি উড়ে পড়ছে চোখে, মুখে এসে।
যন্ত্রণায় বুক জ্বলে। নিঃসঙ্গ দুপুরময় আর
নির্জন প্রলাপ রাখে। কী যে বেদনার শস্যকণা
রোদ্দুরে শুকোতে দেয়, বাতাসের নির্জন প্রহার
মসৃণ শরীরে রাখে রোদ্দুরের আতপ্ত সান্ত্বনা।
আবার বিকেল এলে গুটিয়ে সে জড়ো করবে ধারে
দিনের শুকানো ধান, পশ্চিমের বিষণ্ণ আকাশে
সূর্য্যাস্ত ভাঙবে ঢেউ আরক্তিম যন্ত্রণার ভারে
দেহাতী মেয়েটি ঘরে ফিরে যাবে রাত্রির আশ্বাসে।

আবার সকাল হবে। উবু হয়ে বসে ঘুরে ঘুরে
গান গেয়ে উঠোনে সে ধান শুকোবে অন্তহীন শীতের রোদ্দুরে।

নাম ● বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

মুখ তোলো, একবার মুখ তুলে তাকালে সবিতা
আমি হবো সকালের গাঢ় প্রসন্নতা।
এখন গভীর রাত্রি—গভীর গভীর।
একদা যাদের শুধু সোনার হরিণ বলেছিলে
আজ দেখি তারা সব মিশে গেছে সংসারের হাটে।

স্মরণের প্রান্তে সেই প্রতিষ্ঠিত প্রথম প্রত্যয়
'সবিতা' 'সবিতা'—সূর্য্য বলে যেন একদা তোমায়
সংযত দুহাত দিয়ে প্রেমের আশ্বাসে গড়েছিল।
সেই নাম অর্দ্ধস্ফুট এখন শুধুই
একমাত্র স্বপ্নের শরীরে শর্বরীর
তবু তুমি কোন সুখে সোনার হরিণ হলে নিজে।
এখন গভীর রাত। কেউ নেই কাছে কিংবা দূরে
মুখোমুখি শুধু দুটি মৃত প্রায় আলো ;
একবার মুখ তুলে জ্বলো ফের সুন্দর সবিতা
স্থির জেনো, আমি তবে প্রথম প্রসন্ন প্রিয় নাম।

নিরবধির ত্রিকোণমিতি ● নিখিল কুমার নন্দী

রোদের জ্যামিতি এই কাঁচ জানলা খুলে দেবো কার ছায়া দেখে
সঙ্গে ঘনাবে যেই আকাশের বাঁকে বাঁকে। ঘন গন্ধ মেখে
একটি করুণ স্মৃতি চুলের মুখের আহা সমস্ত দেহের
নেমে আসবে মনে পড়বে দূরান্তিক অস্তিত্ব স্নেহের।

দূরন্ত জীবন এই পডন্ত দিনের বেলা শান্ত হয়, হৃদয়ের
পীড়িত সে একটানা একতারা—আঙ্গুলের টংকারে
গৈরিক ভাঁটির গান কে শোনায়ঃ ওরে ত্যাখ এই ভালো
শ্রাবণের কৃষ্ণমেঘ প্রাণকে জুড়োক, হায় দাহময় ফাল্গুন ফুরালো
এখন সে নিয়ত সঙ্গী। কে তাকে সরায়; পঞ্চশরে
দগ্ধ শেষে এবার বর্ষার মালা স্নিগ্ধশ্যাম খোঁপায় শরীরে
জড়িয়ে জীবন ঘিরে তার আনাগোনা শুরু চির অভিসার—
অলক্ষ্য নিয়তি; তাই পথক্লান্ত ক্ষণসঙ্গী শাশ্বত গভীরে অধিকার
পেয়েছে, পরমাশ্চর্য্য! আপনারে বাইরে খুঁজে নিস্ফল সফর
আজ সাঙ্গ করে ধীরে সংসারের নাট্যকাব্য সঙ্গীতের স্বর
ব্যঞ্জনাদি নির্য্যাতিত নিরুত্তর হাওয়া ভেঙ্গে সঙ্গোপনে লীন
যমুনার স্রোত বেয়ে নৌকাবিলাসী আমরা অতঃপর
বিবেক বিহীন।

এ মুহূর্তে তাই যেন সীমাস্বর্গ দুজনে বসার মূঢ় সন্ধ্যালগ্ন রীতিঃ
তুমি নেই আমি তবু একা-একা গল্প পড়ি আমাদের নিরবধি
অনুচ্চার্য্য এ-ত্রিকোণমিতি।

প্রতিবিম্ব ● তরুণ স্যান্যাল

প্রতিবিম্ব, ছাখো ঐ নির্জন ব্যথার শিখাগুলি,
দূরের নক্ষত্র হতে রেখেছে দাহিকা অঙ্গরাগে,
ভস্মশেষ চিহ্নগুলি আমি নিত্য চিত্রে গড়ে তুলি
এই মুখে শ্লথ দেহে কেলাসিত রেখারুদ্ধ দাগে।
আরও কিছুদিন বেঁচে, ভালবেসে, মুছে, ভালবেসে,
নদীর কল্লোল হতে কিছু হাসি মুখে এঁকে যাব,
যে তীর্যক রৌদ্র, ঘেরা দেয়ালে বয়স হয়ে মেশে,
আরও কিছুক্ষণ পরে, সে রুপায় চিকুর বানাব।

মৃত্তিকা আমার মুখে, লোনাস্বাদে, গন্ধে ঘূর্ণধূলা,
এমন মধ্যাহ্ন একা স্তব্ধ বীথি প্রান্তরে, শয়নে,
তটিনীরা নিদ্রা যায়, দূরে হীরা বালুকা বেলা
তৃষ্ণাগুলি নৃত্যপরা, স্মৃতি দুঃখ নিঃশব্দ বয়নে,
কিছু ফুল হাতে রাখি, কিছু তার পিষ্ট আর্দ্র ছাপ
প্রতিবিম্ব, বীথিকারা রাখে নষ্ট ফুলের বিলাপ ॥

প্রৌঢ় এবং সূর্য্যাস্ত ● তারাপদ রায়

আর কতকাল বাঁচবো জানিনা, জানিনা ; কতকাল
ম্লান সূর্য্যাস্তকে সাক্ষী রেখে এই জানলায় বসে ;
ম্লানতর ছিন্নপত্র ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত বয়সে
সতত সঞ্চরমান ; কতকাল, আরো কতকাল ?

চতুর্দ্দিকে সব কাঁটাজমি রুক্ষ, আগামী আবাদে
কিম্বা কোন দূরকালে ধান্যভারে ছেয়ে যেতে পারে,
এ আশা করি না ; শুধু বুঝি বহু পরিশ্রমে যারে
ঘরে তোলে, যে লক্ষ্মীকে, তার বাসা সুদূর প্রবাদে ।

বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সূত্রে ইচ্ছা জুড়ে দিয়ে কেহ কেহ
দীর্ঘজীবী, কেহ সুখী প্রসাদী কুসুমে মালা গাঁথে
'সে রকম বাঁচবো কিনা ?' প্রত্যহের সূর্য্যাস্তের সাথে
দেখা হলে তাই ভাবি, সূর্য্যোদয় দেখে কেহ কেহ ।

একদা কৈশোর কালে হিরণ্ময় অতনু সাগরে
দেখেছি আহত সূর্য্য রক্তাক্ত, গভীর কালো জলে ;
চিরদিন সেই রক্ত সঞ্চারিত স্মৃতির অতলে
দিনান্তের অস্তাভাসে স্থির শূন্য অন্ধকার ঘরে ।

অন্ধকার, চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত দীর্ঘ অন্ধকার,
স্মৃতিচ্ছায়া, অন্ধকার, বনচ্ছায়া অন্ধকার আর
কবেকার ম্লান ছায়া—ছায়া-ছায়া লুপ্ত চারিধার ;
গৃহচ্ছায়া অন্ধকার, এই গৃহ দীর্ঘ অন্ধকার।

রূপবতী

আবদুস সাত্তার

এখন হৃদয়ে তার কমলাপুরের রূপবতী
যে মেয়ে প্রত্যূষে ওঠে নিকোয় উঠোন, তার দেহ
রঙিন আয়না, তাতে ফোটে সুখী দিন। আর কেহ
না জানুক সে জেনেছে তার সংসার অশ্রুমতী
মেঘাচ্ছন্ন দিনে বসে কেবল কান্নার মোহমায়া।
তাইতো যুবক আজ পরিপূর্ণ সুখের কাঙাল ঃ
সৌখীন দিনের হাতে গোছানো শান্তির মায়াজাল
রাত্রির গভীরে হোক তৃপ্তিময় প্রেমের প্রচ্ছায়া
প্রত্যহ বিদীর্ণ-সুখ সংসারের ঢিলে জামা পরে
অন্ধকার পাঁকে ডুবে সে যুবক রাত্রির আকাশ
ভরায় নিঃশ্বাসে, আর ছেঁড়াখোড়া মেঘের আভাষ
ক্রমশঃ জমাট হয়ে ছেয়ে দিল চাঁদের প্রণতি
আঁধারে জোনাকি জ্বলে মিটমিট্! নির্জন প্রহরে
কেবল হৃদয়ে তার কমলাপুরের রূপবতী।

আহত প্রয়াস ● সমরেন্দ্র ঘোষাল

নুইয়ে পড়া ভারাক্রান্ত হৃদয়টা
চোখ-ছেঁড়া যাতনার নিঃসীম নির্লিপ্ততায় আজও
ছেদহীন অবিশ্রাম হারিয়ে চলেছে।

আর এই পড়ন্ত বিকেলের রোদ্দুরের সীমান্তে
আমার এই ভাবনাগুলো সুরহারা বীণার মত
বেসুরো প্রাণ-প্রাচুর্য্যের গান কেন যে গেয়ে চলে
সেও দূর্বোধ্য নয় এখন আমার কাছে।

কোন মানে নেই যার
সেই সব মনগড়া কল্পনার সীমানা সাজাতে
সর্পিল আকাশ-কাঁদানো এই গাঢ় অন্ধকার পথে
এর আগেও এসেছিতো আমি।

জীবনকে মুঠো ভরে পেতে গিয়ে যেখানে
ধূসর রুক্ষ ধূ-ধূ অসীম নৈঃশব্দময় শূণ্যতাকে বুকে নিয়ে
সে এক অন্য গান গেয়েছি।

তারই প্রেরণায় তবুও
রিক্ততার আবরণে অবরুদ্ধ এই আমার

অসহায় আহত প্রয়াসকে
আজও রাঙিয়ে চলি অসীম সুন্দর-স্নাত তোমার
এই চেতনার রঙে আমার উচ্ছ্বলতার
অকথিত সুগোপন প্রেমে।

নিশির ডাক ● মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভীষণ ঘণ্টা বেজে উঠলো সন্ধ্যেবেলায়
কে চায় দয়া, কেয়ার গন্ধ, ভালোবাসা ?
ক্ষুধার্ত্তকে সুধার পাত্র বিলোয় যে, সেও
জ্যোৎস্না যখন রক্তে জ্বালায় নীল দুরাশা
কাতর সেতুবন্ধে ঘোরে ব্যর্থ তৃষায়।

ঘণ্টা বাজলো : তোমার ফুলও ফিরিয়ে দেবো।
চাইনে আলো, গন্ধসুধা। প্রায়ান্ধকার
এই পাতালে কে আমাকে বাঁচাবে, কার
সাধ্য আছে শূণ্যতাকে রক্তে ছোঁবার
যখন, দিবারাত্রি মলিন জলে ডোবে ?

জলের দারুণ কৌতূহল ; সে পরমায়ু
ছিন্ন ক'রে ভাসিয়ে দেয় শূণ্যতাতে।
শূণ্যতা ? সে ফুলের মতো
হিংস্র ঘূর্ণি রোগের মতো
ভীষণ ঘণ্টাধ্বনির মতো
নিরতিশয় অবহেলার সঙ্গে ঝরায়
হলুদ পাতা, ভালোবাসা, প্রতিশ্রুতি !

কে ? অনন্ত সন্ধ্যা ? তবে সময় হলো !
মন্দিরে শেষ চূড়োয় ঘণ্টা বাজায় অন্ধ ।
এখন কিছুই হয় না, তোমার গোপন গন্ধ
ফিরিয়ে নাও : আমি তোমায় মুক্তি দিলাম

পোশাক ● মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য

"কারণ, পোশাক নেই সে হেতু আমার মৃতদেহ
ফুটপাতে পড়ে আছে। পৌরসভা বড়ই দয়ালু
চুক্তিবদ্ধ শকুনেরা বুকে নিয়ে অনবদ্য স্নেহ
গোল হয়ে বসে আছে। নাগরিক শিরঃপীড়া মুগ্ধ করে তালু।

আমার শীতল রক্তে শহরের খোলা নোংরা নর্দমার জল,
মস্তিষ্কে সাজানো আছে সবজান্তা শয়তানের বাসা,
স্বর্গে না নরকে যাব স্থির করতে পারি না কেবল
মরবার পরও দেখি বেঁচে আছি খাসা।

অর্থ যশ প্রতিপত্তি দিগ্বীজয়ী পাণ্ডিত্য প্রতিভা
কিছুই ছিল না, তাই চিৎপটাং হয়ে আমি আজ
নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে আছি। ফুলের স্তবক শোকসভা
বিব্রত করে না জেনে বড় সুখী সুহৃদ সমাজ
যে যার ফিকির খোঁজে ফুটপাত থেকে বহুদূরে
কাকের সঙ্গীত আহা, কী মধুর নির্জন দুপুরে।"

শুনেই বন্ধুরা বলে, "নৈরাশ্যবাদীর কথকতা
সামাজিক সততায় আস্থাহীন এই ভদ্রলোক
সমস্ত নৈতিক মূল্য ধ্বংস করে যার প্রগলভতা
আসুন সকলে মিলে একে আজ শূলে দেওয়া হোক।

"জানি। সমাধান খোঁজে পুঁথিপথে যত্নপি নির্বোধ
তারও মৃতদেহ পোড়ে আকাংখার বিকল্প আঁধারে,
রৌদ্রে প্রতিপন্ন সত্য করে মৌল স্বপন পরিশোধ,
হৃদপিণ্ড নামক চিতা নিভে যায় বুকের বাঁ ধারে।
সুতরাং শুয়ে আছি শবাধার শূন্য এই সাজানো শহরে
আমাদের মৃতদেহ অন্ধকার প্রতিটি পোশাক
ভেসে যাচ্ছে গোধূলির রক্তবর্ণ উদ্বিগ্ন প্রহরে
আমার শোণিতে ভেজা দৃশ্যাবলী তীব্র পরামায়ু ফিরে পাক"

তুমি না ফোটালে ● দুর্গাদাস সরকার

তুমি না ফোটাও যদি সে ফুল ফোটাবে অন্যজন!
যতদিন অরণ্য চঞ্চল হয়, সমুদ্র গর্জন করে,
আকাশে আলোর আয়োজন -
আসব তোমার কাছে।
তবু না ফোটাও যদি সে ফুল ফোটাবে অন্যজন।

কারো ফুল ফোটাবার ভার।
কেউ শুধু ভালবাসে তুলে আনা ফুলের সম্ভার
সে ভালবাসাকে
ঢেকে রাখা একান্ত অশুচি
আত্মার স্বরূপ।
শুনেছ কি দূর দিগন্তে ধ্বনির বিদ্রূপ।

আকাশের কালো পিচে ভরুক পা দুটো—
তবু ছোটো রুক্ষপীত সূর্য্যের দিকেই।
আজ্ সে থাকুক যেখানেই
সে ফুল ফোটায় বারবর
সে করে আলোর আয়োজন।
তুমি নাও শুধু তাই সাজাবার ভার।
তুমি না ফোটাও যদি সে ফুল ফোটাবে অন্যজন।

অপু, এখানে থেমোনা ● তুষার চট্টোপাধ্যায়

অপু, এখানে থেমো না। আরো কিছু দূর হেঁটে গেলে
তোমার নিশ্চিন্দপুর খুঁজে পাবে। সামনে সাহস
তোমাকে দু'হাতে ডাকছে। পথগুলো ডাইনে বাঁয়ে হেলে
সমানে ছড়িয়ে যাচ্ছে। নীলকণ্ঠ পাখীর বয়স
শুধুই সংগীতে বাড়ে। তুমি জানি কোন পাখী নও।
বিকেলে সূর্য্যের মৃত্যু দেখে ক্লান্তি শয্যায় রেখোনা।
পশ্চাতে পতন হাঁটছে। রৌদ্রজলে কোলাহল হও।
তোমার সম্মুখে শান্তি, অপু, তুমি এখানে থেমো না।

সোনা-পাগল ● পরিচয় গুপ্ত

সোনা-পাগল একটি মানুষ
আমি দেখেছি
কেমন অবোধ শিশুর মত

তাল তাল সোনা নিয়ে
লোফালুফি করে,
খুশীর ঝোঁকে মদ খায়
আর সেরা অবাস্তব স্বপ্ন দেখে !

লক্ষ্মী বৌ তার
ছায়ার মত পাশে পাশে ঘোরে
একটু আদর
কিংবা পুরুষালি রসিকতা,
কিন্তু ওখানেই ট্রাজেডি ;
মানুষটা বলে—
তোমার ওই মাংসপিণ্ডগুলো
সোনা হলে
আমি আরও কটি শেয়ার কিনতাম

বৌটা বিষ খেল।
আঁচল ভাঙা চিরকুট বললে—

অঙ্গ আমার সোনা নয়,
হৃদয়টা ছিল তামাম সোনায় গড়া—

লোভী পুরুষটা কান পেতে শোনে
মৃত্যু-ঘন-উষ্ণতায়
সোনার তালটা
হাহাকার করে গলে যাচ্ছে।

কবি ও লেখনী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখনীরে করি অনুনয়
কলম তুই রে, ধনু নয়।
তবুও কলম থাকে বেঁকে
সায়কে বিঁধিবে ওকে একে—
জিভে তার মাখানো গরল
কালো মসী কুটিল তরল।
বলি তারে-শোন ওরে শোন্,
এল আজ চৌঠা শ্রাবণ,
আকাশের-পানে দেখ চেয়ে
এক পাল হাতী আসে ধেয়ে
গরজনে জাগায় গমক
দাঁতের বিজলী ঝকমক—
এমন গভীর বরষায়
নব মেঘদূত লিখি আয়।
ফোঁস করে কহিল লেখনী,—
জীবন কি কিছুই দেখনি ?
বরষা যতই ভাল হোক
মানুষ জাতটা ছোট লোক।
কহিলাম— আজিকে বঁধূরা ;
শ্লথবাস মিলন-মধুরা ;

শুনিয়া মেঘের গুরু গুরু
সভয়ে বাঁকায় কালো ভুরু,
ছল করে চকিত ত্রাসে
বঁধুরে জড়ায় বাহু পাশে,
সিঁথির সিঁদুর রেখা সুখে
এঁকে দেয় বঁধুয়ার বুকে।
কানে কানে কপোত কুজন
দেহ দিয়ে দেহের পূজন
আজি এই খেলা ঘরে ঘরে
শীতল শয়ন শেজ পরে—
আজিকে ওদের কথা স্মরি
আয় রচি ঝুমর কাজরি।
কলম কহিল বাঁকা-মুখে
কবিতা লিখিব কোন সুখে
মানুষের মনে গাদা গাদা
কামনার পাঁক আর কাদা।
আমি কই, ওরে কালামুখি,
বৃথা যাবে বরষা ঋতু কি ?
চরণে নূপুর নাচাবি না ?
মেঘ-মল্লার বাজাবি না ?
দুলিবি না আজি মোর সাথে
দোলন-চাঁপার ঝুলনাতে ?
ওই দেখ কাজল কালিমা
ঢেকে দিল আকাশের সীমা,

সজল আঁধার ভরা ধরা
পিরীতি রভস জর জরা
আজ তুঁই হেসে কথা বল
গদগদ সোহাগ সরল,
পায়ে ধরি করি অনুনয়
কলম তুই রে ধনু নয়।
কলম শোনে না মোর কথা
কুৎসা করিতে শুধু রতা ;
কালিমাখা মুখ নেড়ে কয়
জগৎ কলুষ বিষময়।
লেখনী ফেলিয়া দিয়া তবে
আজিকে রসের পূজা হবে
বেণু বীণা মৃদং মাদল,
মুখর করিবে সভাতল,
কেকারব ডাহুক দাহুরী
হরষে বাতাস দিল ভরি
রসের অমরাবতী থেকে
ঠাকুর কবিরে লব ডেকে,
আসিবেন কবি কালিদাস
জয়দেব গোবিন্দদাস
জ্ঞানদাস গাবেন হরিষে
'রিমঝিম শবদে বরিষে'।
অলকাপুরীর নারী এসে
নাচিবে নিচোল উড়ায়ে সে।

আমি বসে রব এক কোণে
ডুবে যাব রসের গহনে
ভুলে যাব নিঠুরা এ ধরা
তামসী কাজল রুচিহরা।

মনে আগুন লেগেছে ● ভি. আর. কান্ত

মনে মনে আগুন লেগেছে, অন্ধকার মহাদেশে
দেখতে পাচ্ছো একটি আলোর শিখা ক্রমে এগিয়ে
আসছে। সেই আলোক শিখায় প্রতিহিংসা পরায়ণ
সাপের মাথার মণির দ্যুতি। সিংহের চোখে যেন
মৃত্যুর ভয়াল ছায়া। কিন্তু বাতাস তুমি স্তব্ধ হও,
প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে তুমি কখনো যেন না বইতে থাকো।
এই আলোক শিখা হয়তো কোন প্রেতিনীর নিঃশব্দ ইসারা
বাতাস তুমি স্তব্ধ হও। বন্য হরিণের শিংয়েও রয়েছে ভয়
আর বিভীষিকার ছায়া! বাতাস তুমি স্তব্ধ হও, শান্ত হও;
সূর্য্যের বীর্য্যে বিষুব বৃত্তের গর্ভে যার জন্ম এই হল সেই দেশ
আফ্রিকা।

মারাঠী কবি ভি, আর, কান্তের,
"চিনগারী" কবিতার অনুবাদ।
অনুবাদক—অনিল গঙ্গোপাধ্যায়।

রাজপথের ধারে : উঁচু বেদী ● পিচ্চমুর্ত্তি

মাথার ওপর ভারী বোঝা নিয়ে পথ চলতে চলতে
ঘাড়ে অসম্ভব ব্যথা হয়েছে। গলায় যেন প্রায়
ফাঁসি আটকে এসেছে ; চোখদুটো অসম্ভব পরিশ্রমের জন্য—
কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে ; কপালের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম
ঘামের স্বাদ লোনা, আমি মেলায় চলেছি আমার এ বোঝা
বওয়ার আর কি শেষ হবে না ? তোমাকে সারাক্ষণ কাঁদতে হবে,
অঝোরে চোখের জল ফেলতে হবে আর তোমার বোঝা তোমাকে
নিজেকেই বইতে হবে। সারাক্ষণ কেঁদে কেঁদে যন্ত্রণা সহ্য করে
তবে মা শিশুর জন্ম দেন। তোমাকে কেউ 'তোমার কষ্টে সাহায্য
করতে আসবে না। আমি সারাক্ষণ বোঝা বয়ে চলেছি এখনো
কঠিন শ্রমের আমার শেষ নেই। আমার কোমরে দারুণ ব্যথা
আমি কোমরে হাত দিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি।
আমি কষ্ট দুঃখ সহ্য করে করে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছি।
এদেশে কি হাত বদলের কাজ বদলের ব্যবস্থা নেই ?
আমি চাই আর কেউ আমার দুঃখের কিছুটা অংশ নিক
এমন কি কেউই নেই ? আমি তাকে খুঁজে চলি।

তামিলকবি পিচ্চমুর্ত্তির "চুমৈতাংগি"
কবিতার অনুবাদ।
অনুবাদক—অনিল গঙ্গোপাধ্যায়।

কালকের মন্দিরের গান ● গোবিন্দন নায়ার

রাশি রাশি 'অলরী' ফুল ফুটেছে রক্তের মত লাল ফুল ;
দিনের আলো ফুরিয়ে এল, রাত্রির অন্ধকারে এই ফুলগুলো
বহ্নি শিখার মতো। সময় বলছে 'এই তো যথার্থ সময়',
আমি যুক্ত করে তোমার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করছি,
দেবীর গলদেশে রক্ত ফুলের কুঁড়ির মালা, দেবী এখনো কুমারী,
আমরা তার কাছে মাথা নত করছি, যুক্ত করে প্রার্থনা জানাচ্ছি।
দেবীর গলদেশে আগুনের মত ঝলসানো লাল আরো একটি
মালা। আমাদের দেবী এখন আরো বেশী ক্রোধ পরায়ণা ;
রক্তের মতো লাল 'তেচ্চি' ফুলের মালা এখন দেবী গলদেশে
পরিধান করছেন। এখন তিনি তাথৈ তাথৈ করে তাণ্ডব নৃত্যে
মত্ত হয়ে উঠেছেন তার মাথায় রক্তাম্বর, দেবী প্রলয় নৃত্যে মেতে
উঠেছেন।

মালয়ালম কবি গোবিন্দন নায়ারের
'কাবিলে পাট্টু,' কবিতার অনুবাদ।
অনুবাদক - অনিল গঙ্গোপাধ্যায়।

রবাবের সুর আর ● খুরশীদ-উল-ইসলাম

রবাবের সুর আর সেতারের মূর্চ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে
কখনো কখনো যেন পেয়ালা থেকে তরল সুরা
চলকে পড়ে যায়। কখনো সূর্য্য স্তিমিত হয়ে আসে,
খাপ থেকে তরবারী খোলা হয়, কখনো আবার
বাতাস নদীর বুকে ঢেউ জাগায়, ভোরের হাওয়া ধীরে
বইতে থাকে। কোনো কোনো বিশেষ ধরণের মানুষ
বড়ই রহস্যময়, সব সময়ই যেন, কঠিন আড়ালের
অন্তরালে থাকে, আবার কেউ কেউ হয়তো সব সময়ই
আত্মপ্রচার করে। কেউ হয়তো মধুর গান ভালবাসে,
আবার কেউ হয়তো লোকের অযথা চেঁচামেচি ও শহরের
কোলাহল শুনে আনন্দ পায়। অনেক চিন্তা হয়তো
উচ্চ দর্শনতত্ত্বের মতো, আবার অনেক ভাবধারা,
যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অর্থহীন।
অনেক রং হয়তো পৃথিবীর এখানে সেখানে ছড়ানো
আবার অনেক গাছে হয়তো ফুল ফোটেনা, কিন্তু
বসন্ত ঋতুতে তা অপরূপ দেখায়। অনেকে হয়তো
মীরের দুঃখবাদী কবিতা থেকেও রসপান, আবার
অনেকে খসরুর কবিতা খুবই ভালবাসেন। কখনো রাত্রি
আসার জন্য প্রতীক্ষায় থাকে, কখনো এমন কোন কাহিনীর
সুরু হয়, যার আর শেষ নেই ; কখনো যন্ত্র সঙ্গীতের
অপূর্ব্ব সুর ঝংকার আসল যন্ত্রটিকেই প্রায় অবলুপ্ত

করে দেয়। এই রং আর রূপ, এই আলোছায়া
আর আকাশের রোদ ; প্রকৃতির এই জালবোনা সব
জায়গায় ; হে ঈশ্বর ! কি করে আমি বলব এই এত বৈচিত্র
সত্য নয় ! বাস্তব নয় ! শুধুই মরিচীকা।

উর্দু কবি খুরশীদ-উল-ইসলামের
'সরে রহে' কবিতার অনুবাদ।
অনুবাদক :—অনিল গঙ্গোপাধ্যায়।

আষাঢ় ● রাজেন্দ্র শা

আষাঢ় মাসে অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে, ক্ষীণস্রোতা
নদীগুলো ভরপূর হয়ে উঠেছে। সারা আকাশে
কৃষ্ণ মেঘের মেলা, মাটির ওপর সারাক্ষণ
বৃষ্টির ধারা নেমে আসছে। তপ্ত হৃদয়ের
জ্বালা এখন শান্ত, সবার মনে গভীর আনন্দে
প্রাণে উৎসাহ। বাঁশবন থেকে মধুর বাঁশীর-স্বর
ভেসে আসছে, গোধূলীবেলায় গাভীর দল যখন
ঘরে ফিরে আসছে তখন বেজে উঠছে মৃদঙ্গের
বোল। নৃত্য আর গানের মধুর উচ্ছ্বাসে চারদিক
ভরপূর, মনে হয় যেন কামদেব নৃত্য করছেন।
এদিকে কোকিলের অবিরাম কুজন, বৃষ্টির ধারায়
শরীর ভিজে যাচ্ছে ; কিন্তু দেহের সবটুকু ভেজেনি,
কারণ অনেকেই গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছে।
একটি গাছের শাখায় দুটি পারাবত খুবই কাছাকাছিতে
বসে আছে আর তারা আনন্দে, গভীর আবেশে শব্দ করছে।

গুজরাটী কবি রাজেন্দ্র শা'র
'আষাঢ় কী কেলি' কবিতার অনুবাদ।
অনুবাদক :—অনিল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভাবান্তর • বরিস পাস্তেরনাক

মাথার উপরে উল্কাবৃষ্টি, অন্তরীপেতে বন্যা,
লোনা জলধারা সৃষ্টি হননে, এবং শুকালো কান্না।
শয়নাগারে অন্ধ তমসা, মননেতে চাঞ্চল্য,—
স্ফিংক্‌সের মুখ রাক্ষুসে কান সাহারায় পাতে ধৈর্য্যে।

মোমবাতিগুলি পুড়ছিলো আর মনে হ'ল পেল দৈত্য
রক্ত হিমের স্পর্শ এবং বাড়তি আকাশী হাস্য
উপছালো ঠোঁটে। রাত্রির শেষ। জোয়ারে ভাঁটার লগ্ন
ঠিক সে সময়। মরুকোণ থেকে চপল পক্ষ বায়ু
আলোড়ন দিল সমুদ্র বুকে, বইলো মরুর ঝড়ঃ
দেবদূত নিল ঠাণ্ডার ঘুমে দ্রুতগতি নিঃশ্বাস।
মোমবাতিগুলি পুড়লো, "প্রত্যাদিষ্ট" পাণ্ডুলিপি
শুকালো এবং গাঙ্গেয় ভূমে খুললো ভোরের দ্বার।

পাস্তেরনাকের ভেরিয়েশন নং '৩' এর
অনুবাদ।
অনুবাদক :—বিমল চক্রবর্ত্তী।

মৃত্যু ● রাইনের মারিয়া রিল্‌কে

মহত্ত্বের বৃত্তে ঘেরা মৃত্যু—যিনি হাসি মস্করায়
রহস্যের আবরণে, মোরা যার রক্ষণাধিকারে।
তার কান্না, কী আশ্চর্য্য, আমাদের বুকের গভীরে
বাজে, যবে স্বীয় সত্ত্বা খুঁজি মোরা জীবন-নিতলে।

রিলকেব 'ডেথ্ ইজ্ গ্রেট'
নামক কবিতার অনুবাদ।
অনুবাদক :—বিমল চক্রবর্ত্তী।

কুল্‌-এ বুনো হাঁসের দল ● ইয়েটস্‌

শারদ হাসির মুক্তা ঝরে সবুজ গাছের ফাঁকে,
রুক্ষ ধূলায় মরণি-প্রাপ্ত গহন বনের বাঁকে।
প্রদোষ আলোয় নিথর জলে আকাশ পড়ে ধরা,
বাড়তি জলের উপল বুকে ওই বুনো হাঁস ওরা।

উনিশ শরৎ অতীত হলো প্রথম গোণার পরে।
গোণা আমার কই হল শেষ ? ঐ যে ডানার ভরে
শূণ্যে ওরা ছড়িয়ে পড়ে মুগ্ধ খুশীর রোলে ;—
ছিন্ন-মালা সাজায় যেন মুক্ত-গগন-কোলে।
কী অপরূপ উজল গাঁথা-তাকিয়ে আমি থাকি ;
ব্যথিত মম হৃদয় আজি বিষাদ ছায়ায় ঢাকি।

কুল-এর এ তীর সেদিন ছিলো প্রদোষ আলোয় ঢাকা,
উড়তে ছিল সেদিন তারা কাঁপিয়ে তাদের পাখা,—
অপলক সেই প্রথম দেখা—হাল্কা চরণ ফেলে,
হায়রে আমার সেদিনগুলো হারিয়ে কোথায় গেলে !

ক্লান্তিহীন কিন্তু এরা মুগ্ধ যুগলতায়।
নীল আকাশে, শীতল জলে ব্যস্ত মুখরতায়।
কোমল ওদের হৃদয় মাঝে সময় অচল নাকি ?
যাব না যেথায় পাখনা মেলে আবেগপ্লুত পাখী।

নিথর জলে ভাসছে বেশ। ত্যজি এমন তীর
নলখাগড়ায় অন্য কোথাও বাঁধবে পুনঃ নীড় ?
হঠাৎ জেগে দেখবো যেদিন, চলেই গেছে তারা—
কোন সে হ্রদের মানুষ সেদিন পাবে খুশীর ধারা ?

ইয়েটস্ এর 'দি ওয়াইল্ড সোয়ানস
এ্যাট কুল' এর অনুবাদ।
অনুবাদক :—চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুর ঃ সন্ধ্যার ● বদলেয়ঁর

এখনি মৃত্যুর শুরু ঃ কেঁপে ওঠা দুর্ব্বোধ্য সংলাপে
ফুলেদের মহামারী কফিনের তুহীন চুম্বনে
সুরভি বেদনারিক্ত সান্ধ্য-জীবনের অপলাপে
বেজে চলে নিরাশার নৃত্য-সুর উদাত্ত স্বননে।

ফুল তাই ঝরে যায় ঃ কোন এক অদৃশ্য সংকেতে
ভয়লীন তাই রচে মেঘদূত ভগ্ন হৃদয়ের
চকিত রোমাঞ্চ লাগে বেদনার ধূসর অংকেতে
আকাশ সুন্দরী সাজে ম্লান হয়ে লাল 'ওপেলের'
নরম বিছানা পেতে। সূর্য্য জ্বলে রক্তিম প্রকাশে,
আমার এ রিক্ত মনে ক্লান্তি আজ অজয় দূর্ব্বার ;
কঠিন বিদীর্ণ বুক ভরে যায় মৃত্যু অবকাশে
তোমার এ জন্মদিন প্রতিদিন ঃ বেদনা অপার।

বদলেয়ঁরের 'হারমণি ডু সয়্যার'
কবিতার অনুবাদ।
অনুবাদক ঃ—সুখেন্দু শ্রীমাণি।

অভিযান ● সাঁ জঁ প্যাস

তিনটি দীর্ঘ ঋতু পার হলাম, প্রতিষ্ঠা করলাম নিজেকে মর্য্যাদায়;
জানি, ফলন্ত হবে এই জমিন যেখানে আমার শাসন কায়েম হল,
সকালের রোদে তলোয়ার দেখ, কী সুন্দর, কী সুন্দর সমুদ্র,
আমাদেরই অশ্বখুরে অর্পিত এই পৃথিবী — নির্বীজ
নিষ্পাপ আকাশটুকু আমাদের হাতে তুলে দিল ;
সূর্য্যের নাম একবারও উচ্চারিত হয়নি,
কিন্তু তার তেজ আমাদের মধ্যে রয়েছে
আর ভোরের সমুদ্র, যেন কিছুই নয়, মনের এক কল্পনা,
অনুমিতি।

হে তেজ ! তোমার গান ধ্বনিত হয়েছে আমাদের রাত্রির
পথে পথে
ভোরের পুণ্যাহে আমাদের স্বপ্নের ঐতিহ্যের কীইবা
জেনেছি আমরা ?

আরও একটি বৎসর তোমাদের সাহচর্য্য পাব ;
হে ফসলের প্রভু, নূনের প্রভু, এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত
এই হুকুমত।
ডাকব না অন্য কোনো সমুদ্রতীরের মানুষকে ; না,
একেবারেই না ;

গোধূলী বেলার শোভার অন্ত নেই ●

পার লাগারক্ভিষ্ট

গোধূলী বেলার শোভার অন্ত নেই।
স্বর্গের থেকে ক্ষরিত প্রণয় যেন
জ্বলছে এবং নিভছে
মাঠের ওপরে, পৃথিবীর ঘর-বাড়ীর ওপরে-আকাশে।
সবই যেন বড় কোমল, কান্ত ; কেউ মমতার
হাত বুলায় তাদের শরীরে।
দূরের ভূমিকে মুছে দিয়েছেন ঈশ্বর।
সবই এত কাছে, সবই এত দূরে তবু।
যা কিছু পেয়েছে মানুষ, পেয়েছে শুধু দু'দিনের জন্য।
সবই ত আমার। অথচ আমার কাছ থেকে সব কিছু
ফিরিয়ে নেবেন তিনি।
খানিক বাদেই সব কিছু ফের ফিরিয়ে নেবেন তিনি।
এই গাছ, ওই মেঘ, আর এই পায়ের তলার মাটি।
চিহ্নবিহীন চলে যেতে হবে, একা।

সুইডিশ কবি পার লাগারক্ভিষ্টএর
কবিতার অনুবাদ।
অনুবাদক :—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

আছো কি হেথায় কেহ ● ওয়াল্টার ডি. লা. মেয়ার

'আছো কি হেথায় কেহ ?' শুধালো পথিক
চাঁদের আলোতে দুয়ারে হানিয়া কর,
অশ্ব তাহার তৃণ আহরণে রত
স্তব্ধ কাননে তুলিল যে মর্ম্মর।
গম্বুজ হতে মাথার উপরে উড়ে গেল কোন পাখী ?
পুনঃ কর হানি 'আছো কি হেথায় কেহ ?' পথিক কহিল ডাকি
কারু কাজ করা জানালার ফাঁকে কেহ তো দিল না দেখা ;
বাহিরে যেথায় পথিক দাঁড়ায়ে নীরবে আছিল একা।

ধূসর তাহার নয়ন-দিঠিতে প্রশ্ন রহিল আঁকা।
অশরীরী যাঁরা সেই গৃহবাসী উঠিল চমকি সবে,
ভাবে নাই তারা মরজগতের কেহ আসি কথা কবে।
চাঁদ-ঝরা রাতে অসীম আঁধার হলের প্রান্তে আসি
শিহরি শুনিল, পথিক কণ্ঠে নীরবতা গেল নাশি,
সচকিত হয়ে নির্জন রাত চুপি চুপি উঠে হাসি।

এতক্ষণে বুঝি পথিক বুঝিল ভিতরে রয়েছে কারা,
ইন্দ্রিয়াতীত কোন অনুভূতি বলে—তাই বুঝি তারা
স্তব্ধ এমনতর, বারবার ডাকে কথা নাহি বলে।
আহ্বানে তার আবছায়া রাতে বায়ু কাঁপে থরথর ;
তারকা খচিত পর্ণছায়ায় রচিত যে অম্বর—

তারি তলে থাকি অশ্ব তাহার তোলে একা মর্ম্মর।
সহসা আবার কর হানি দ্বারে অধিক উচ্চস্বরে
মস্তক তুলি উর্দ্ধ নয়নে কহিল পথিক শোনো—
'বোলো তাহাদের বোলো,'
আমি এসেছিনু সাড়া তবু পাই নাই
প্রতিশ্রুতি আমি রেখেছি আমারি জেনো ;
একাকী কেবল ছায়া সুগভীর নীরব প্রাসাদ মাঝে
কথাগুলি তার প্রতিধ্বনি হয়ে একেলা একেলা বাজে
অশরীরী শ্রোতা শুনিল সকলি রহিল অচঞ্চল,
অশ্বের পদাঘাতে বনপথ হয়ে উঠে উচ্ছল ;
ক্রমে ক্রমে সেই শব্দ মিলালো, গেল চলি বহুদূরে,
ধীরে ধীরে পুনঃ সেই জগতের শান্তি আসিল ফিরে।

ওয়াল্টার ডি, লা, মেয়ার রচিত 'দি লিজনার্স'
কবিতার অনুবাদ।
অনুবাদক :—পূরবী ঘোষ।

প্রভাত সঙ্গীত ● ফোথ্‌

শুভ সন্দেশ বয়ে আনিলাম তোমার কাছে,
কহিতে এলাম আকাশে উঠেছে রবি যে।
উষ্ণ তাহার দীপ্তি মধুর পড়েছে গাছে,
শিশিরে তাহার ফুটেছে চপল ছবি যে ॥
বলিতে এলাম—কানন পেয়েছে জাগর-বাণী
লতায় পাতায় কী পুলক আহা জাগিছে।
প্রতিটি পক্ষী নাচিছে হঠাৎ পক্ষ হানি,
ফাগুন-তৃষ্ণা সেখানে যে পথ মাগিছে ॥
মধ্যরাতের সব কিছু প্রেম পুনঃ যে ধরি
প্রভাতে এলাম তোমার তন্দ্রা টুটাতে,
আমার সকল আত্মা যে হায় ব্যাকুল মরি,
তুমি কী পারিবে আশার কুসুম ফুটাতে ?
স্বর্গের হাওয়া সবটুকু বুঝি ভাসিয়া আসে,
ভাসিয়া আসে সে আমারে পাগল করিতে।
গানের ভাষা তো হারাইয়া গেছে চিত্তাকাশে
তবু গান জাগে তবু সুখ জাগে মরিতে ॥

ফোথ্‌-এর 'মর্ণিং সং'
কবিতার অনুবাদ।
অনুবাদক :—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।